নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্যান্য বই

অসমতল　　হলদে বাড়ি　　দ্বীপপুঞ্জ

উল্টোরথ　　পতাকা

অক্ষরে অক্ষরে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র



দিগন্ত পাবলিশার্স-পক্ষে, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯, থেকে অজিত দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

আষাঢ়, ১৩৫৬

আড়াই টাকা

প্রচ্ছদপট — শ্রীসূর্য রায়

দি প্রিন্টিং হাউস-এর পক্ষে ৭০, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯, থেকে গিরীন্দ্রনাথ সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।

সুসাহিত্যিক ও চিকিৎসাবিদ্

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আষাঢ়, ১৩৫৬ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অক্ষরে অক্ষরে

সারদা প্রেসের শুভ উদ্বোধন পয়লা আষাঢ়। সেই উপলক্ষ্যে স্বত্বাধিকারী নীলকমল চট্টোপাধ্যায় তার কয়েকজন বন্ধুকে চায়ে নিমন্ত্রণ করবে। অনেক বন্ধু অনেক রকম ভাবে এই প্রেসের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে। কেউ মূলধনের খানিক অংশ ধার দিয়েছে, লাইসেন্স সংগ্রহের তদ্বির করেছে কেউ, কেউ পরিচিত টাইপ ফাউণ্ড্রি থেকে কিছু কম হারে দিয়েছে টাইপ কিনে। কেউ মেশিনের খোঁজ দিয়েছে, কেউ মেসিনম্যানের। অল্প মাইনের পরিচিত দু'চারজন কম্পোজিটার সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে কেউ, সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ নীলকমল। তাছাড়া প্রেস চালাতে হলে এদের অনেককেই হয়তো সময়ে অসময়ে প্রয়োজন হবে। প্রেস খুলবার সময় এদের না বললে চলে না। আর, সবাই যখন আসবেই তখন সামান্য একটু জলযোগের ব্যবস্থা না করলেও ভালো দেখায় না। বেশি নয়, টাকা বিশ পঁচিশ হয়তো খরচ হবে বড় জোর।

তিরিশে জ্যৈষ্ঠ রাত্রে যুক্তিগুলি নিজের বোন ঊর্মিলাকে শোনাচ্ছিল নীলকমল। বলতে গেলে ঊর্মিলা নীলকমলের ডান

হাত। বাইরে যেমন সাহায্য করেছে বন্ধুরা, ঘরে তেমনি উৎসাহ দিয়েছে বোন। ঊর্মিলা না থাকলে এ প্রেস হয়তো খোলাই হোত না। টাকা পয়সা খরচের ব্যাপারে ঊর্মিলার একটু কুণ্ঠা আছে। এই কুণ্ঠাকে নীলকমল প্রশ্রয় দেয়। নিজে একটু বেশি খরচে। ঊর্মিলা যদি একটু হাত টেনে না ধরে তাহলে তার পক্ষে টাল সামলানোই মুসকিল।

দাদার অনুনয়ের সুরে ঊর্মিলা মুখ টিপে একটু হাসল, 'বিশ পঁচিশে তুমি কিছুতেই পারবে না। যেতে যেতে প্রায় পঞ্চাশে গিয়েই দাঁড়াবে। তা যাক। টাকাটা আমি স্যাংশন করছি দাদা। সত্যিই প্রেস খোলার দিন ওঁদের বলা দরকার। তোমার জন্য যথেষ্ট করেছেন ওঁরা।'

নীলকমল বলল, 'কেবল আমার জন্য? আর তোর জন্য বুঝি নয়? প্রেস বুঝি কেবল আমার? এই জন্যেই বলেছিলাম প্রিন্টার হিসাবে তোর নামটাই দিয়ে দিই।' ঊর্মিলা বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা। নামটা দিন কয়েক পরে পালটে নিয়ো। এবার এসো দেখি একটা লিস্ট ক'রে ফেলি কাকে কাকে বলব। অনেক রাত হয়ে গেছে। ও ঘরে বউদির বোধ হয় এক ঘুম হয়ে গেল।'

নীলকমল বলল, 'তার তো সন্ধ্যা থেকেই ঘুম।'

কিন্তু রাত সত্যিই হয়েছে। খানিক আগে সারদাবাবুর ঘর থেকে ঢং ঢং করে এগারটা বাজবার শব্দ শোনা গেছে।

মা এসে বার দুই তাগিদ দিয়ে গেছেন, 'তোরা কি শুবিনা কেউ। না সারারাত কেবল প্রেস প্রেসই করবি।'

এতক্ষণে নিভাননীও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারা বাড়িতে আর কেউ জেগে নেই, সারা পাড়াটা নিস্তব্ধ।

ঊর্মিলা হাই তুলে বলল, 'যাও শোও গিয়ে। লিস্টটা না হয় কালই করা যাবে।'

নীলকমল বলল, 'না না আজই শেষ করা যাক, কাল কোন কালে আসে না।'

ঊর্মিলা মনে মনে হাসল। দাদার এই অধ্যবসায়টা নতুন। এখন ভাগ্যে টিকে থাকলে হয়।

কাগজ কলম নিয়ে নীলকমল নিজেই লিস্ট করতে বসল বন্ধুদের নামের। সুরেন মিত্র, নৃপেন মল্লিক, নির্মল সেহানবীশ, শিশির বাঁড়ুয্যে —

ঊর্মিলা বলল, 'কেবল বন্ধু নয়, দু'চারজন কুটুম্বকেও কিন্তু বলতে হবে দাদা। অন্তত তাঐ মশাই আর বউদির দুই ভাই গণেশবাবু, পরেশবাবুকে।'

নীলকমল ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলল, 'তাঁদের আবার কি দরকার?'

ঊর্মিলা বলল, 'দরকার মানে? তাঁদেরই তো সব চেয়ে আগে বলা উচিত। তাঁরাও তো সাহায্য করেছেন।'

কি কথা মনে পড়ল নীলকমলের, গম্ভীর মুখে বলল, 'বেশ।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'ওঁদের নিচে সরিৎ মুখুয্যের নামটাও বসিয়ে দিই ঊর্মিলা। প্রকারান্তরে সেও তো কম সাহায্য করেনি। তার কাছ থেকে ওরকম আঘাত না পেলে প্রেসের কথা আমরা ভাবতে পারতাম না!'

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে ঊর্মিলা বলল, 'দাদা।'

'কি বলছিস ?'

'তুমি কি আমাকে অপমান করতে চাইছ ?'

নীলকমল সস্নেহে বোনের পিঠে হাত রেখে বললে, 'পাগলী কোথাকার। আমি অপমান করতে চাই সেই শূয়োরটাকে।'

ঊর্মিলা মৃদুস্বরে বলল, 'তার নাম আমাদের মুখে এনে দরকার নেই দাদা।'

নীলকমল বলল, 'না, দরকার আছে। আমাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে নিজের গণ্ডির বাইরে না এসে ভেবেছে সে মান বাঁচাবে। তা আমি হতে দেব না। এখানে নিমন্ত্রণ ক'রেই তাকে আমি ডেকে আনব। তারপর আরো পঁচিশজন ভদ্রলোকের সামনে তাকে আমি অপমান করব।'

ঊর্মিলা অদ্ভুত একটু হাসল, 'কি ক'রে অপমান করবে শুনি ? কি বলবে ?'

নীলকমল এবার যেন একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, 'বলব আবার কি ? কিচ্ছু বলব না। কোন রকম আদর যত্ন করব

না। সকলের সামনে তাকে তুচ্ছ করব, অবহেলা দেখাব। তাতে কি কম অপমান হবে ওর ?'

ঊর্মিলা হাসল, 'তা বোধ হয় একটু হবে। কিন্তু ওইটুকুর জন্যে অত কাণ্ডে দরকার নেই দাদা। কোন প্রয়োজন নেই তার সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক রাখবার।'

নীলকমল বলল, 'কিন্তু শত্রুতার সম্পর্ক না রাখলেও থেকে যাবে। তাকে আমি জীবনে ক্ষমা করতে পারব না। জানিস এক সময় আমার ইনটিমেট ফ্রেণ্ড ছিল সরিৎ। আর সেই কিনা —'

ঊর্মিলা বলল, 'ওসব কথা থাক দাদা। সব তো চুকে গেছে, আর কেন ? শুভদিনে তার নাম আর কোরোনা।'

নীলকমল বলল, 'উঁহু, একটা কার্টসি তো আছে। সে তার বিয়ের সময় আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিল। আমাদেরও রিটার্ণ দেওয়া দরকার !'

বলে সত্যিই তালিকায় সরিৎ মুখোপাধ্যায়ের নামটি লিখে রাখল নীলকমল। লিখতে লিখতে বলল, 'সবাইকে মুখে গিয়েই বলব। কাউকে কাউকে ফোন করলেও হবে। কিন্তু মুখুয্যে মশাইকে 'পত্র দ্বারা'ই নিমন্ত্রণ করা যাক, কি বলিস ?'

ঊর্মিলা বলল, 'করো তোমার যা খুসি।'

নীলকমল পর পর আরো কতকগুলি নাম বসাল তালিকায়, তারপর বলল, 'এবার খরচপত্রের একটা —'

উর্মিলা বাধা দিয়ে বলল, 'খরচপত্রের এস্টিমেট কালও করা যাবে দাদা। তার সময় আছে। সেজন্য ভেব না। যাও শোও গিয়ে এবার!'

নীলকমল বলল, 'অন্যদিন তো এমন করিসনে। আজ বুঝি খুব ঘুম পেয়েছে তোর ?'

উর্মিলা বলল, 'হ্যাঁ আমার পেয়েছে, তোমারও পাওয়া উচিত। রাত কি কম হোল নাকি ?'

কাগজপত্রগুলি উর্মিলার ছোট টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখে নীলকমল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

উর্মিলা উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করল। ছোট্ট কুঁজোটি থেকে জল ঢালল কাঁচের গ্লাসে, সমস্ত গ্লাসটি নিঃশেষ ক'রে, অল্প একটু জলে সেটি ধুয়ে নিয়ে চূড়োর মত রেখে দিল কুঁজোর মাথায়। তারপর শুতে চলল। হঠাৎ টেবিলের ওপর নামের তালিকাটা চোখে পড়ল উর্মিলার! চার ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটি কালো চিরুণীটা দিয়ে চেপে রেখে গেছে নীলকমল। নামগুলি দেখা যাচ্ছে না, সাদা পিঠটা কেবল দেখা যাচ্ছে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটু একটু ক'রে কাগজের ভাঁজটা খুলে ফেলল উর্মিলা। তারপর নীলকমলের ফাউন্টেন পেনটা তুলে নিয়ে নিমন্ত্রিতদের নামের

লিস্ট থেকে সরিৎ মুখোপাধ্যায়ের নামের ওপর দিয়ে সোজা একটা দাগ টেনে গেল। মনে মনে বলল, 'কেবল গোঁ আছে দাদার। বুদ্ধি শুদ্ধি এখনো কিছু হোল না।'

সুইচ অফ্ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল উর্মিলা। রাত অনেক হয়েছে, এবার ঘুমোন যাক।

দুই

কিন্তু রাত বেশি হলেই কি সব দিন ঘুম আসে? বরং বেশি রাতে মুছে দেওয়া, কেটে দেওয়া দিনগুলি বেশি ক'রে ফিরে ফিরে আসতে চায়।

কথাটা মিথ্যে নয়। এম, এ, ক্লাসে আলাপ হলেও ঊর্মিলার দাদার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিল সরিৎ। তারপর মাস ছয়েকের মধ্যে নীলকমলের জায়গায় ঊর্মিলা নিজে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এমন ঘটনা ঊর্মিলাদের বাড়িতে আগে কোনদিন হয়নি। এর আগে নীলকমলের নতুন বন্ধু তো দূরের কথা, স্কুলের পুরোনো বন্ধুরাও বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারত না। কদাচিৎ যদি বা দু-একজন আসত, ঊর্মিলারা তিন বোন কেউ বেরুত না তাদের সামনে। ভারি কড়া নিষেধ ছিল মার। তিন বোনের মধ্যে সব চেয়ে ছোট ঊর্মিলা। দাদা যখন কলেজে ঢুকল, কত আর বয়েস হবে তখন, এগার বারোর বেশি নয়। কিন্তু তখন থেকেই দিদিদের মত তাকেও আগলে আগলে চলতেন মা। একটু লাফালাফি ছুটোছুটি করলে দিদিদের মত তাকেও গাল দিতেন ধিঙ্গি মেয়ে বলে। অথচ দিদিরা তার চেয়ে একজন

ছয় আর একজন চার বছরের বড়। কিন্তু হলে হবে কি? বাড়ন্ত গড়ন বলে ছোড়দির সমান সমান দেখাত তাকে। তারপর বছর দুয়েকের মধ্যে লীলা আর শীলা দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেল। হাজার তিনেক টাকা দেনা হলেন উর্মিলার বাবা সারদারঞ্জন। কিন্তু দুই মেয়ের বিয়ের উৎসবের অবসাদ পাঁচ বছরের আগে ঘুচল না। তারপর ফের সম্বন্ধ দেখা চলতে লাগল উর্মিলার। লীলার বর পুলিস কোর্টের উকিল, শীলার বর এম-বি পাশ ডাক্তার। কিন্তু উর্মিলার সম্বন্ধ আরো কয়েক ধাপ নিচের সিঁড়ি থেকে আসতে লাগল। পঞ্চাশ টাকা মাইনের স্কুল মাস্টার, চল্লিশ টাকার মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী, স্টেশনারী দোকানের দু'একজন সেল্‌স্‌ম্যানের সঙ্গেও সম্বন্ধ এল। কিন্তু কোনটাই টিকল না। কেউ বড় বেশি পণ-যৌতুক দাবী করল, কেউ সরাসরিই জানিয়ে দিল মেয়ে পছন্দ হয় নি।

স্কুলের হাইজিনের বইতে উর্মিলা পড়েছিল স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য। কিন্তু ছাই জানে হাইজিন লেখক। তাকে তো আর সেজেগুজে বছরে চার পাঁচ বার ক'রে সৌন্দর্য বিচারক-দের কাছে দাঁড়াতে হয় না। বরং দু'তিনটা সম্বন্ধ তার স্বাস্থ্য ভালো থাকার জন্যই ফিরে গেল। অভিভাবকেরা বললেন, 'ছেলের সঙ্গে মানাবে না।' আইবুড়ো মেয়ের স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য নয়। তিন বোনের মধ্যে লম্বায় চওড়ায়, শক্তি-সামর্থ্যে সব

চেয়ে স্বাস্থ্যবতী আর পরিশ্রমী হলে কি হবে, ঊর্মিলার রং শ্যামলা, মুখের ডৌলটুকু মোটামুটি সুন্দর হলেও নাক চোখা নয়, চোখ বড় নয়, মণির রং কটা কটা। ঠোঁট দুটি পাতলা কিন্তু দাঁতগুলি বড় বড়। তবু হাসলে সুন্দর দেখাত যদি কালো মাড়ি একটু বেশী রকম বেরিয়ে না পড়ত। মাথাভরা চুল আছে ঊর্মিলার, সে চুল গোড়ালী পর্যন্ত না হলেও হাঁটু ছাড়িয়ে পড়ে। কিন্তু চুলের বাহুল্য কেবল তো মাথায় নেই, দুই বাহুতেও দেখা দিয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছা করত না ঊর্মিলার, দেখতে চাইত না নিজের কুরূপ। তবু সেই রূপহীনতার কথা নানাভাবে. নানাজনের কাছ থেকে কানে এসে ঢুকত।

আই. এ, তে একবার দিয়ে ফেল ক'রে, আর বি, এ. তে হল থেকে একবার উঠে গিয়েও চব্বিশ বছর বয়সে এম, এ, টা এক চান্সে পাশ ক'রে ফেলল নীলকমল। পাশের পর বলল, 'ওরকম সাবেকী ধরণে বিয়ে দেওয়া যাবে না ঊর্মির। আমার কথা যদি শোন, আমার ওপর যদি ভার দাও তাহলে ছ'মাসের মধ্যে আমি ওর বিয়ে দিয়ে দেব। টাকাকড়ির কিছু দরকার হবে না।'

নিভাননী বললেন, 'হ্যাঁ, পাশ পরীক্ষা দিয়ে ঘরে বসে আছ, ছ'মাসের মধ্যে একটা চাকরি জোটাতে পারলে না, একটা পয়সা আনতে পারলে না, আর তুমি নামাবে মেয়ে।'

নীলকমল বলল, 'আমার ওপর ভার দিয়েই দেখ না।'

বলে কয়ে ভার কেউ দিল না কিন্তু জোর ক'রেই উর্মিলার ভার গ্রহণ করল নীলকমল। নিচের বৈঠকখানা ঘরে সমবয়সী বন্ধুদের আড্ডা বহুদিন থেকেই বসত। খালি ঘর ঝেড়েপুছে এলেও ভরা ঘরে যাওয়ার হুকুম এর আগে উর্মিলা কোনদিন পায়নি। কিন্তু এবার চা দেওয়ার জন্য উর্মিলার ঘন ঘন ডাক পড়তে লাগল। বিধবা কাকীমা আর ছোট ছোট খুড়তুতো দুটি ভাই আছে উর্মিলাদের। তারা স্কুলে পড়ে, পড়ার ব্যাঘাত হবে ভেবেই যেন নীলকমল এসব ছোটখাট ফাইফরমাসের জন্য তাদের ডাকত না। বছর কয়েক উর্মিলাও পড়েছে স্কুলে। সেকেণ্ড ক্লাসের পর আর তাকে স্কুলে যেতে দেননি নিভাননী। বাড়িতে পড়ে পড়েই ম্যাট্রিকের জন্য তৈরী হচ্ছে। কিন্তু কোন বারই ঠিক সাহস পাচ্ছে না দিতে। এদিকে আঠার ছাড়িয়ে উনিশে পড়েছে বয়স। নীলকমল মাঝে মাঝে একেক দিন ধমক দেয়, একেক দিন বোঝাতে বসে নেসফিল্ডের গ্রামার, লিখতে দেয় লুসি-পোয়েমসের ব্যাখ্যা, বীজগণিতের ফরমুলা, জ্যামিতির উপপাদ্য। তারপর আবার ঢিল পড়ে, কবিতা লেখা নিয়ে মেতে ওঠে নীলকমল, তখন তার আর কাছেও যাওয়া যায় না। উর্মিলাও কি কাছে যেতে চায়? ইউক্লিড থেকে অনেক সরস শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, মাসিক সাপ্তাহিকের ধারাবাহিক উপন্যাস। ডেভিড কপারফিল্ডের ক্রিটিক্যাল

কোশ্চেনের জবাব মুখস্থ করার চাইতে অনেক উপভোগ্য অজানা লেখকের রাশ রাশ ছোট ছোট গল্প। কিন্তু তার চাইতেও উপভোগ্য হয়ে উঠল নীলকমলের বন্ধুদের আলাপ-আলোচনা। কখনো সাহিত্য, কখনো সিনেমা, কখনো দুরূহ রাজনীতি, সমাজনীতি। সব কথা উর্মিলা বুঝতে পারত না। কিন্তু কথা কি সব বুঝবার জন্য ? শুনবার জন্য, দেখবার জন্য নয় ? কেটলি থেকে চা কাপে ঢালতে ঢালতে উর্মিলা আড়চোড়ে চেয়ে চেয়ে দেখত কে কি ভাবে কথা বলে। কে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কে আগাগোড়া শান্ত নরম সুরে থেমে থেমে বলে যায়, কে তোৎলায়, কে দাঁত দিয়ে নখ খোঁটে। সব কথা বুঝতে পারত না উর্মিলা, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারত, সে ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেরই উৎসাহ বেড়ে গেছে। সবাই বলবার জন্য ব্যাকুল, সবাই শোনবার জন্য পাগল।

প্রথম প্রথম ভারি লজ্জা করত উর্মিলার, আড়ষ্টতা কিছুতেই কাটত না, ঘরে ঢুকবার সময় পা কাঁপত, চা ঢালবার সময় হাত কাঁপত, কেউ 'তাকে সম্বোধন ক'রে কোন কথা বললে বুক কাঁপত দুরু দুরু ক'রে। প্রথম কিছুদিন চা দিয়েই, কিংবা দাদার ফরমায়েস মাফিক ওপর থেকে বইপত্র এনে দিয়েই চলে আসত উর্মিলা। দু'তিন সপ্তাহ বাদে কিছুক্ষণ করে সে থাকতেও লাগল, দাদার আদেশ, দাদার বন্ধুদের অনুরোধ!

নীলকমল বলত, 'বোস, বোস। এদের কথা শুনলে অনেক শিখতে পারবি।'

নীলকমলের বন্ধুদের কেউ হয়তো আপত্তি করত, দোহাই ঊর্মি দেবী, আমাদের মাস্টার ভাববেন না। আমরা এখানে গল্প করতে, গল্প শুনতেই এসেছি। শিখতেও আসিনি, শেখাতেও আসিনি।'

কেউ বা তার সমর্থনে আর এক লাইন জুড়ে দিত, 'সেজন্য স্কুল কলেজ আছে, বন্ধুবান্ধবের বৈঠকখানা আর যাই হোক পাঠশালা নয়, চা আর আড্ডাশালা।'

ঊর্মি দেবী! সম্বোধন শুনে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত ঊর্মিলার। ছোট বড় খান চার-পাঁচ চেয়ার আর লম্বা ধরণের একটা পুরোনো টেবিল — একলা নিজেদের একতলার ছোট বৈঠকখানা ঘরটুকুতে যেন ঢোকেনি ঊর্মিলা, ঢুকেছে একখানা গোটা উপন্যাসের মধ্যে, আর সে উপন্যাসের নায়িকা সে নিজে। সখী নয়, পার্শ্বচরী নয়, একেবারে নায়িকা। সরু গলির, পুরোনো বাড়ির স্যাঁৎসেতে একখানা ঘর যেন নয়, মাসিক পত্রের গল্পে উপন্যাসে বর্ণিত কার্পেটে, সোফায়, কৌচে সাজানো এ যেন সেই বালীগঞ্জের বড়লোকের ড্রইংরুম। ঊর্মি, উমু থেকে একেবারে ঊর্মি দেবী। ওপরের শোয়ার ঘর আর নিচের এই বৈঠকখানা। মাঝখানে গোটা কয়েক সিঁড়ির মাত্র ব্যবধান। কিন্তু ঊর্মিলার মনে হোত সে যেন সম্পূর্ণ

এক আলাদা রাজ্যে এসে পড়েছে। পূর্ব গোলার্ধ থেকে পশ্চিম গোলার্ধে কিংবা পৃথিবী থেকে একেবারে মঙ্গল গ্রহে।

কিন্তু দাদার বন্ধুদের অমন চমৎকার চমৎকার কথার উত্তরে ঠিক পছন্দমত জবাব যেন কিছুতেই দিয়ে উঠতে পারত না। নামকরা লেখকদের গল্প উপন্যাসের নায়িকার কথাগুলি মাঝে মাঝে মুখস্থ করত, কিন্তু ঠিকমত খাটাতে পারত না। ওপর থেকে বানানো সাজানো মুখস্থ করা কথা নিচে নামতে নামতে দাদার বন্ধুদের মুখোমুখি বসতে না বসতে কোথায় হারিয়ে যেত, কিছুতেই যেন তা খুঁজে পেত না ঊর্মিলা। কিন্তু এটুকু দেখতে পেত, ছিঁটেফোঁটা যা দু-একটা কথা সে বলতে পারে তাতেই যেন খুশি হয়ে ওঠে দাদার বন্ধুর দল। এটুকু বুঝতে পারত, দাদার বন্ধুরা কনে দেখা পরীক্ষকের চোখ নিয়ে আসেননি, এসেছেন বন্ধুর বোন দেখা চোখ নিয়ে। সে চোখ যেটুকু দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়, সে কাণ যেটুকু শোনে তাতেই খুশি হয়ে ওঠে, যেটুকু পায় তাই অপ্রত্যাশিত বলে ভাবে। ঊর্মিলা ভুলে গেল তার রূপ নেই, তার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় সামান্য, বৈঠকখানায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে অনন্যা বলে মনে হতে লাগল ঊর্মিলার।

কিন্তু নীলকমলের বৈঠকখানায় যারা আসে তাদের প্রায়ই কায়স্থ, বৈদ্য, সাহা, সোনার বেনে। উচ্চ বর্ণের দুজন ব্রাহ্মণ অবশ্য আছে। কিন্তু তাদের একজন বিবাহিত, আর

একজন মাত্র ম্যাট্রিক পাশ, ব্যাঙ্কের পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের লেজার-কীপার।

নিভাননী শুনে বললেন, 'তাহলে লাভ কি! তা'হলে মিছামিছি আড্ডা দিতে দিস কেন মেয়েটাকে ?'

ঊর্মিলার বাবা সারদাবাবুও একদিন ধমকে দিলেন ছেলেকে, 'কি হচ্ছে তোমাদের, তোমরাই জানো।'

নীলকমল বলল, 'কি আবার হবে। লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় যত বাড়ে ততই ভালো। আগের চেয়ে ঊর্মি কত স্মার্ট হয়েছে দেখেছেন ? সরিৎ মুখুয্যে পর্যন্ত সেদিন ওর প্রশংসা করছিল।'

নিভাননী বলে উঠলেন, 'মুখুয্যে! ওদের মধ্যে মুখুয্যে আবার কেউ আছে নাকি ?'

নীলকমল জবাব দিল, 'আছে। ওই যে সেদিন সব চেয়ে দক্ষিণের চেয়ারটায় বসে কথা বলছিল, ওরই নাম সরিৎ মুখুয্যে। চমৎকার কবিতা লেখে।'

নিভাননী মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'তাহলেই হয়েছে। বিদ্যাবুদ্ধি চাল চুলো সব বুঝতে পারছি।'

নীলকমলও কবিতা লেখে। মুখ বাঁকাবার হেতু ছিল নিভাননীর।

নীলকমল প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'তাহলেই হয়েছে মানে ? তুমি ভেবেছ কবিতা যারা লেখে তারাই অপদার্থ, না ? কিন্তু

আমার বন্ধুদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি পদার্থবান সরিৎ। তোমরা যে অর্থে পদার্থবান বল সেই অর্থেই। পড়াশুনাতে ভালো। ইংরাজীতে ফার্স্ট ক্লাস।'

নিভাননী বললেন, 'চাকরি বাকরি কি করে?'

নীলকমল বলল, 'চাকরি একটা অবশ্য করে। ইংরেজী খবরের কাগজের অফিসে।'

নিভাননী বললেন, 'মাইনে কত পায়?'

নীলকমল হাসল, 'জিজ্ঞাসা করিনি। শ'দুয়েক টাকা পায় নিশ্চয়ই। কিন্তু মাইনে দিয়ে করবে কি? চাকরি তো টাকার জন্য করে না, সখের জন্য করে। চাকরির তো দরকার নেই ওর। বড়লোকের ছেলে। বড়বাজারে নিজেদের হার্ডওয়ারের বিজনেস মানে লোহা-লক্কড়ের কারবার আছে।'

নিভাননী আর একবার নৈরাশ্যের ভঙ্গি করলেন, 'তাহলে এখানে ওর যাতায়াত না করাই ভালো। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়ে তো আর লাভ নেই! হ্যাঁ, যদি আমার লীলা-শীলার বেলায় আসত তাহলেও না হয় —'

উর্মিলার দুই দিদি লীলা আর শীলা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হলেও বড়লোকের মেয়ের মতই সুন্দরী। আড়াল থেকে মা আর দাদার আলাপ শুনে মনে মনে আর একবার আহত হোল উর্মিলা। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দাদার অন্যান্য বন্ধুদের মত সরিৎবাবুও তার দিকে দু' তিনবার

আড়চোখে তাকিয়েছিলেন। উর্মিলার সঙ্গে আলাপ করবার ঔৎসুক্য তাঁর চোখে দেখা গিয়েছে। নিজে দেখতে ভালো না হলে হবে কি, কে কি দেখে, কে কি দেখতে চায়, তা তো দাদার বন্ধু-সংসর্গে এসে উর্মিলা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে।

দাদাকে নিরালায় পেয়ে উর্মিলা তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কথাটা কি তুমি মাকে ভুলাবার জন্য বানিয়ে বললে দাদা ?'

নীলকমল অবাক হয়ে বলল, 'কোন কথাটা ?'

এবার একটু আরক্ত হোল উর্মিলা, আমতা আমতা ক'রে বলল, 'মানে — ওই যে — মানে তুমি তখন বললে না, সরিৎবাবু আমার প্রশংসা করেছেন। যত সব বাজে কথা।'

নীলকমল বলল, 'না রে না, বাজে কথা নয়। সরিৎ কথা কম বলে বটে, কিন্তু একটাও বাজে কথা বলে না, মুখে আর কলমে সমান ওর ধার।'

উর্মিলা বলল, 'কিন্তু আমার সম্বন্ধে কি বলছিলেন ? আমার মত মেয়ের কি প্রশংসা উনি করবেন ? আমার সম্বন্ধে কখনই বা কথা উঠল ?'

নীলকমল বলল, 'যখন ট্রাম লাইন পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে এলাম তখন।'

কি কথোপকথন হয়েছিল তখন দুই বন্ধুর মধ্যে নীলকমল তার প্রায় বিস্তৃত বিবরণ দিল উর্মিলাকে। সরিৎ বলেছিল, অনেকে কলমে ছবি আঁকতে চান, বাক্যকে চিত্রবাক্য ক'রে,

তোলেন। কিন্তু কলমের কাজ আর তুলির কাজ তো এক নয়। কলম দিয়ে ছবি আঁকতে পারে না সরিৎ, চায়ওনা। কিন্তু তুলি ধরতে একেক সময় ইচ্ছা করে ওর, ইচ্ছা করে ছবি আঁকতে।

নীলকমল হেসে জবাব দিয়েছিল, 'ব্যাঙের মত একেকটি যা অক্ষর তোমার হাতের, তাতে তুলি হাতে নিলে অতি অপূর্ব ছবিই তুমি আঁকতে। একটা লাইন সোজা ক'রে টানতে পার না তার আবার —'

সরিৎ বলেছিল, 'কিন্তু বাঁকা ক'রে তো পারি। সেও বুঝি কম কৃতিত্বের কথা। আমি তুলি ধরলে তোমাদের নদী, পর্বত, ফুল পরীর ছবি আঁকতাম বুঝি ভেবেছ? ব্যাঙের ছবিই আঁকতুম। এই যে খানিক আগে গালে হাত দিয়ে একটি মেয়ে তন্ময় হয়ে বসেছিলেন, এঁকে তুলতুম তাঁর ছবি।'

ঊর্মিলা মুখ ভার করল, 'তোমার বন্ধু বুঝি ব্যাঙের সঙ্গে আমার তুলনা দিলেন দাদা?'

নীলকমল বলল, 'দূর পাগলী, ঠিক তুলনা দেওয়া বলে না ওকে। তা ছাড়া ব্যাঙ তো তার চোখে শুধু ব্যাঙ নয়।'

'তবে কি?'

নীলকমল সরিতের কথা উদ্ধৃত করে বলেছিল, 'রূপের আর এক বিচিত্র প্রকাশ। সরিৎ বলে, সাধারণ লোকে রূপ দেখে আর পাঁচজনের ধার করা চোখ নিয়ে। কিন্তু শিল্পীর

রূপদর্শন আর এক জিনিস। সে রূপ দেখেনা, কুরূপ দেখেনা, বস্তু কি ব্যক্তির স্বরূপ দেখে। সব মেয়ের মধ্যে এই স্বরূপ ফোটে না। বেশির ভাগ মেয়েই আশে পাশের আর পাঁচজন মেয়ের অনুকরণ করে, একই ঢংএ কাপড় পরে, চুল বাঁধে, ক্রীমে, পাউডারে, লিপস্টিকে মেকআপ করে, আর কিছু করতে পারে না। সাধারণ পুরুষ যেমন চোখ ধার করে, সাধারণ মেয়েরা তেমনি রূপ ধার করে। দু' একজনের ব্যতিক্রম ভাগ্যে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।'

শুনতে শুনতে রোমাঞ্চ হয়েছিল ঊর্মিলার। দাদাকে আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে সরিতের কথাগুলি সে তাড়াতাড়ি একটা খাতায় টুকে নিয়েছিল। এক পিঠে জ্যামিতির সচিত্র উপপাদ্য মুখস্থ লেখা, আর এক পিঠে এই সব কথা। ভারি শক্ত, ভারি দুর্বোধ কথাগুলি, কিন্তু জ্যামিতির উপপাদ্যের চাইতে কঠিন নয়। কিছু যেন বোঝা যায়, এই কথাগুলির সঙ্গে কিছু কিছু যেন মিল আছে নিজের মনের কথার। লিখতে লিখতে ঊর্মিলার মনে হয়েছিল সে এই সব কথা বুঝবার জন্যই সংসারে এসেছে, জ্যামিতির উপপাদ্য লিখতে আসেনি, মুখস্থ করতে আসেনি সংস্কৃত শব্দরূপ।

ঊর্মিলা নিজের অদৃষ্টকে সেদিন মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছিল। কি ভাগ্য যে পাউডারের কৌটো থেকে সেদিন পাউডার ফুরিয়ে গিয়েছিল। কি ভাগ্য যে ধোপা বাড়ি থেকে ধানী রঙের দামী

শাড়িখানা সেদিন এসে পৌঁছোয়নি। তাইতো বিনা মেকআপে, সাধারণ আটপৌরে খয়েরী পেড়ে শাড়িখানা পরেই সেদিন বৈঠকখানায় নেমেছিল ঊর্মিলা। শরীরটা ভালো ছিল না বলে বিনুনী করে খোঁপা বাঁধেনি, বড় এলোচুলের খোঁপা ঘাড়ের ওপর নুয়ে পড়েছিল। শরীরটা জ্বর জ্বর লাগছিল বলে ক্লান্তিতে এক সময় গালে হাত দিয়ে বসেছিল ঊর্মিলা। নইলে তো এমন ক'রে সরিৎবাবুর চোখে পড়ত না। সাধারণ মেয়েদের মত সাজসজ্জা করেই নিচে নামত, আর সরিৎবাবু একবার তাকিয়েই তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতেন। জ্বর অবশ্য রোজ রোজ আসবে না, কিন্তু ইচ্ছা করলেই নিজের বেশবাসকে আটপৌরে ঘরোয়া ধরণের করে নিতে পারে ঊর্মিলা। নিজের রুচির বদলে, পাঁচজনের রুচির বদলে, সাজতে পারে একজনের রুচিতে।

ঊর্মিলা লক্ষ্য ক'রে দেখল সরিৎবাবু নিজেও সাদা-সিধে ধরণটাই পছন্দ করেন। ছেলে বড়লোকের হলে হবে কি, চাল বড়লোকের নয়। চশমায় সোনার ফ্রেমের বদলে গাটাপারচাঁরের ফ্রেম, গায়ে সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবী, বোতামগুলি সোনার নয়, ঝিনুকেরই। পরনে মিলের সাধারণ ধুতি, পায়ে কোনদিন স্যাণ্ডেল, কোনদিন শিরতোলা চটি, কোনদিন বা সাধারণ দামের সু। নীলকমলের অন্য যে কোন বন্ধুর এর চেয়ে বেশি আড়ম্বর আছে সাজসজ্জায়। না, কোন আড়ম্বর

নেই সরিৎবাবুর মধ্যে। নীলকমলের আর এক বন্ধু সুরেন বৈঠকখানায় বসে অনবরত পাইপ টানে, আর এক বন্ধু পান আর নস্যের ভক্ত, আর এক বন্ধু শিশিরের মুহূর্তে মুহূর্তে চা চাই, কিন্তু সরিতের কিছুই যেন চাই না। অবশ্য গোঁড়ামি নেই। পীড়াপীড়ি করলে খান সবই। সিগারেটও খান, চাও খান দু'এক কাপ, কেবল পান আর নস্যি পছন্দ করেন না। তাতে ঊর্মিলাও ভারি খুশি। পান মেয়েরা খেয়ে ঠোঁট লাল করবে, পুরুষ খাবে কেন? আর নস্যি টানাটা দেখতে খারাপ। নাক দিয়ে নেশা করাটা বীভৎস।

সরিতের ধরণ-ধারণ দেখে নিভাননীরও ভরসা হোল। বাপ নেই, ছেলেই সব। কাকা আছেন, কিন্তু পৃথগন্নে। কারবারটাই কেবল এক সঙ্গে আছে, কিন্তু মতামতে, চালচলনে, কাকার সঙ্গে মোটেই মিল নেই সরিতের। ওর নিজের রুচি, নিজের পছন্দ, নিজের মতামতের ওপরই সব নির্ভর করে। মা আছেন বটে, কিন্তু সাবালক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ছেলের মা তো কেবল নাম মাত্র অভিভাবিকা। ছেলে কি ভাবে, কি চায়, তা তিনি কতটুকু জানেন, কতটুকু বোঝেন? আর পুরুষ ছেলে যে কি চায়, কখন কি পছন্দ করে তা কি কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারে? সুন্দর কুৎসিতে কিছু যায়না, কোন বাধা হয় না ধনী দরিদ্রে। কথায় বলে, 'যার সাথে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।' নিভাননীরা তো হাড়ি ডোম নন, কুলীন বামুনই।

আর ঊর্মিলাই বা এমন কি ফেলনা! অমন হাঁটু অবধি চুল আজকাল ক'জন মেয়ের মাথায় থাকে, অমন বাঁকান যুগল ভ্রূ ক'টি মেয়ের চোখের ওপর দেখা যায়, কটি মেয়েকে হাসলে সুন্দর দেখায় অমন! তা ছাড়া, ঘর-গৃহস্থালীর সব কাজ জানে ঊর্মিলা, লেখাপড়াও ওর দিদিদের চাইতে অনেকগুণ বেশি শিখেছে, সেলাই টেলাইও মোটামুটি জানে। রেকর্ড রেডিয়ো থেকে একবার শুনলেই ধরতে পারে গানের সুর, নকল করতে পারে সঙ্গে সঙ্গে। তিন মেয়ের মধ্যে সব চেয়ে মিষ্টি গলা ঊর্মিলার, সব চেয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। রঙ কালো বলেই যে সরিতের মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ছেলে তাকে অপছন্দ করবে, তারই বা কি মানে আছে? সরিতের একেবারে অযোগ্যই বা হবে কেন ঊর্মিলা?

এসব জল্পনা কল্পনা ছেলের সঙ্গে করতেন নিভাননী, করতেন স্বামীর সঙ্গে। আর আড়াল থেকে কান পেতে ঊর্মিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনত। মায়ের কথায় তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি শুনত নিজের মনে। সবদিন যে আড়ালে বলতেন তা নয়, সামনেও বলতেন।

'সরিৎ সেদিন তোর কোন গানটার যেন প্রশংসা করছিল ঊর্মি? কি যেন মন যে বলে চিনি চিনি —। কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত তোমাদের গানের পদ বাপু, মনেও থাকে না। কি যেন বাকি কথাটুকু —'

বাকি কথাটুকু আর পূরণ করত না উর্মিলা, মুখ টিপে টিপে হাসত।

নিভাননী কোনদিন বলতেন, 'আচ্ছা, বালিসের ঢাকনি তো সব চেয়ে সুন্দর হয় তোর হাতে। খদ্দরের কাপড়ের একটা ফুল তোলা ঢাকনি দে না ওকে।'

উর্মিলা ধমক দিত, 'কি যে বল, ঢাকনির বুঝি ওঁর অভাব আছে। তা ছাড়া আমার ভারি দায় পড়েছে পরকে ঢাকনি বিলাতে। বলে কত কষ্ট করে করেছি নিজে।'

নিভাননী মুখ টিপে হাসতেন, কোন জবাব দিতেন না।

একদিন সত্যনারায়ণের পূজো উপলক্ষে, আর একদিন সাবিত্রী ব্রত উদ্‌যাপনে নিভাননী নিমন্ত্রণ করলেন সরিৎকে। সরিৎ দু'দিনই এল। ঘরের ছেলের মতই ধারণ-ধারণ। কাঁঠালের পিঁড়িতে খেতে দিয়েছিলেন নীলকমলকে, সরিৎকে দিয়েছিলেন ফুলতোলা আসনে।

সরিৎ বলেছিল, 'আবার আসন কেন মাসীমা। নিজের ছেলে আর বোনের ছেলে বুঝি এই আলাদা ব্যবস্থা ?'

নিভাননী বলেছিলেন, 'তা নয়। নীলু বড় নোংরা। আসনে বসে ও খেতে জানে না। ছোট ছেলেদের মতই ও এঁটো করে ফেলে।'

সরিৎ হেসেছিল, 'আমাকে দিয়ে বুঝি আর সে ভয় নেই ?'

তারপর কথায় কথায় নিভাননী জানিয়ে দিয়েছিলেন আসনখানা উর্মিলারই নিজের হাতের তৈরী।

সরিৎ জবাব দিয়েছিল, 'তা জানি মাসীমা। কেবল আসনই নয়, থালার ভাত, চার পাশের বাটিগুলির মাছ-তরকারী সবই যে উর্মিলা দেবীর নিজের হাতের তা খেলেই বোঝা যায়, বলে দেওয়ার দরকার হয় না।'

নিভাননী বোধ হয় একটু লজ্জিত হয়েই মুখ ফিরিয়েছিলেন। সরিৎরা চলে গেলে উর্মিলাকে এক সময় বলেছিলেন, — 'যত শান্তশিষ্টই দেখা যাক, আজকালকারই তো ছেলে, অত লজ্জা সরমের ধার বেশী ধারতে পারে না।'

উর্মিলা জবাব দিয়েছিল, 'সেই জন্যই বুঝি তাদের হয়ে সেকালের মা-মাসীদের একটু বেশি লজ্জা সরমের ধার ধারতে হয়?'

নিভাননী বলেছিলেন, 'মুখপুড়ী কোথাকার। এরই মধ্যে কথাবার্তায় একেবারে সরিতের শিষ্য হয়েছিস!'

কিন্তু উর্মিলাদেবী সম্বোধনে নিভাননী সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করেছিলেন, 'ও আবার কি কথা সরিৎ। অতটুকু মেয়ে, তা আবার দেবী দেবী করছ কেন। শুধু নাম ধরে ডাকলেই তো ভালো শোনায়।'

আশ্চর্য, কি ক'রে মেয়ের মনের কথা একেবারেই অক্ষরে

অক্ষরে বলতে পারেন মা। শেষ ছত্রটি উর্মিলাও ওই ভাষাতে বলত।

নীলকমলও প্রতিবাদ করেছিল, 'সত্যি সরিৎ, ওসব দেবী-টেবী ছাড়। তোমাদের মুখে দেবী দেবী শুনলেই আমার মনে হয় যাত্রা থিয়েটারের অভিনয় শুনছি।'

তারপর বাংলা ভাষায় অনাত্মীয়া মেয়েদের সম্বোধন সমস্যা নিয়ে তর্ক উঠেছিল দুই বন্ধুর মধ্যে। সরিৎ বলেছিল বিলাতী অনেক শব্দই তো বাংলা ভাষায় এঁটে বসেছে, মিস, মিসেসেরই বা অনুবাদের কি দরকার।

এবার উর্মিলা কথা বলেছিল, 'তবে যে নিজেই দেবী দেবী করছিলেন।'

সরিৎ জবাব দিয়েছিল, 'ইলিসের মাথায় আর কচুর শাকে মুড়িঘণ্ট খেতে খেতে দেবী কথাটাই মনে আসে, মিস মুখে আসে না। সে যখন রেস্টুরেন্টে বসে চপ কাটলেট খাব, তখন বলব। আপনার কি হতে ভালো লাগে, দেবী না মিস্?'

খানিক আগে দুধের বাটি আনতে উঠে গিয়েছিলেন নিভাননী, উর্মিলা একবার রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'দেবীও নয়, মিসও নয়, যা আছি, তাই আমি থাকতে চাই।'

দাদা পাশেই বসেছিল। কিন্তু সেজন্য তেমন কোন

সংকোচ বোধ করেনি ঊর্মিলা। দাদা তো তখন কেবল আর দাদাই নয় ; সরিতের বন্ধু, সেই সম্পর্কে ঊর্মিলারও।

ঊর্মিলা বলেছিল, 'এত জিনিসের মধ্যে কেবল কচু শাকের মুড়িঘণ্টের কথাই আপনার মনে হোল যে, গলা ধরেছে নাকি ?'

সরিৎ হেসে মাথা নেড়েছিল, 'আমি কি ঝগড়াটে মানুষ যে কচু খেয়ে গলা ধরবে। সত্যি, এমন চমৎকার ঘণ্ট আর কোন দিন খাই নি। ভারি নতুন লাগল জিনিসটা। হাজার চেষ্টা করলেও আমাদের মদন ঠাকুর এমন ঘণ্ট করতে পারবে না।'

তারপর অবশ্য কেবল ঊর্মিলার হাতের ঘণ্টই নয়, তার হাতের আরো অনেক জিনিসের প্রশংসা করেছিল সরিৎ। হারমোনিয়মের রীড টেপার সময় বেশ দেখায় ঊর্মিলার লম্বা লম্বা আঙুলগুলি, সোয়েটারে যখন আনারসের প্যাটার্ণ তোলে, তখনো ছন্দোবদ্ধভাবে ঊর্মিলার আঙুলগুলি নড়তে থাকে। দশটা আঙুল তো নয়, যেন কবিতার দশটি পংক্তি।

একদিন নীলকমল বলল, 'তুমি একটু বুঝিয়ে বল দেখি উমুকে। মাস কয়েক মন দিয়ে পড়াশুনো ক'রে দিয়ে দিক ম্যাট্রিকটা। কেবল দিই দিই করছে, কিন্তু কিছুতেই আর দিয়ে উঠতে পারল না।'

সরিৎ বলল, 'নাইবা দিল। তাতে এমন কি ক্ষতি হবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের।'

সাহস পেয়ে ঊর্মিলা বলল, 'দেখুন দেখি : ছোট ছোট মেয়েদের মত ওই সব ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, জ্যামিতি মুখস্থ করবার বয়স আছে নাকি আমার? মোটেই ভালো লাগে না পড়তে। যখন ওসব নিয়ে বসি কেমন যেন ছেলে-মানুষী ছেলেমানুষী লাগে। মনে হয় এম, এ, পরীক্ষা দেওয়ার বয়সে ম্যাট্রিক দিতে যাচ্ছি।'

নীলকমল ধমক দিয়েছিল, 'কি রকম ইঁচড়ে পেকে গেছে তাই দেখ। যে পরীক্ষায় আমি পঁচিশ বছর বয়সে হাজির হয়েছি উমু নাকি তা উনিশে দেবে।'

সরিৎ জবাব দিয়েছিল, 'তা দিতে পারে বই কি। উনিশ তো ভালো, আগে আগে ন' বছর বয়সেই জ্ঞানে বুদ্ধিতে পঁচিশ বছরের পুরুষের সমান হোত মেয়েরা। আজকাল উনিশে ছাড়িয়ে যেতে না পারলেও সমান সমানই থাকে, নিচে থাকে না। ক্লাসগুলি অবশ্য পাঠশালার নয়, সংসারশালার।'

উমুকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবেও সরিৎ মাথা নেড়েছিল, 'দেখ নীলু, সংসারে দুটো জিনিষ আমার দ্বারা কোন কালেই হবে না, মাষ্টারী আর পুলিসী। তার চেয়ে চল, বরং একদিন সিনেমায় যাওয়া যাক। পড়াশুনোর চাইতে দেখাশোনায় কম শিক্ষা হয় না।'

তারপর দাদা আর তার বন্ধুর সঙ্গে ঊর্মিলা একদিন মেট্রোতে ছবি দেখতে গিয়েছিল। ইংরেজী বই দেখা তার

সেই প্রথম। কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারেনি। কিন্তু নীলকমল সিগারেট কিনতে বেরিয়ে গেলে সরিৎ যখন তার হাতখানা নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরেছিল, তখন কিছুই তার আর বুঝতে বাকি থাকেনি। সম্পর্কে দাদা হলেও নীলকমল একেবারে অবুঝ নয়। সিগারেট কিনে ফিরতে বেশ একটু দেরিই হয়েছিল তার।

কিন্তু তারপর কেউ আর বেশি দেরি করতে চাইলেন না। না দাদা, না বাবা, না মা। আর দেরি করবার ইচ্ছা উর্মিলার নিজেরই কি ছিল? উর্মিলার বুঝতে বাকি ছিল না খদ্দরে মোড়া মানুষটি দেখতে শুনতে যেমন শান্ত, ভিতরে ভিতরে তেমনি তার দুরন্ততার অবধি নেই। অপেক্ষা বোধ হয় সেও আর করতে পারে না, সেও আর করতে চায় না।

তবু সেই সিনেমা দেখার মাস দুই বাদেও সরিৎ যখন নিজে মুখ ফুটে কিছু বলল না, অথচ তিনজনে মিলে আরো একদিন সিনেমা দেখল, আর একদিন বেড়িয়ে এল শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে, তখন উর্মিলার মা বললেন, এবার কথাবার্তা বলতে হয়, ঠিক ক'রে ফেলতে হয় দিনক্ষণ। পাড়ার পাঁচজনে পাঁচকথা জিজ্ঞাসা করছে।'

কিন্তু কে সুরু করবে কথা? নিভাননী স্বামীকে বললেন, 'তুমি তো কর্তা, তুমিই একবার বলে দেখ না সরিৎকে। কি মাসে ওর করবার ইচ্ছা।'

সারদাবাবু মাথা নাড়লেন, 'আমি ও সবের মধ্যে নেই। নিজেরা ঘটকালী করেছ, নিজেরাই জিজ্ঞাসাবাদ করো।'

নিভাননী ছেলেকে বললেন, 'আমারও কেমন যেন একটু লজ্জা লজ্জা করে। তোর বন্ধুকে তুই-ই জিজ্ঞেস কর না!'

নীলকমল বলল, 'আর কারো বলবার দরকার কি? উমি নিজে বললেই তো ভালো হয় সব চেয়ে।'

আড়ালে দাদাকে ডেকে উর্মিলা বলল, 'আমি কিন্তু কিছু বলতে টলতে পারব না দাদা।'

বোনের আনত লজ্জিত মুখের দিকে তাকিয়ে নীলকমল মুখ টিপে একটু হাসল, তারপর বলল, 'আচ্ছা, আমিই না হয় সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি! খুব তো বাহাদুরী করছিলি সেদিন। অনেক বিদ্যা হয়েছে, জ্যামিতি, ব্যাকরণ পড়বার আর বয়স নেই।'

উর্মিলা বলল, 'মাফ করো দাদা। সে সব কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। তুমি যা বলবে তাই করব। শব্দরূপ মুখস্থ করতে আপত্তি করব না।'

নীলকমল বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, শব্দরূপ এবার বিডন ষ্ট্রীটে গিয়ে মুখস্থ করিস। এই আনন্দ খাঁ লেনের অন্ধকার বাড়িতে মুখস্থ টুকস্থ আর হবে না।'

বিডন ষ্ট্রীটে সরিৎদের বাড়ি। দু' তিন দিন আসেনি সরিৎ। শরীর নাকি খারাপ। নীলকমল নিজেই গেল খোঁজ

নিতে। গিয়ে দেখল, দোতলার লাইব্রেরী ঘরে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে সরিৎ আধুনিক ইংরেজী কবিতার সংকলন পড়ছে।

নীলকমল একটু অবাক হয়ে গেল, 'শরীর খারাপ শুনে-ছিলাম তোমার।'

সরিৎ একটু হাসল, 'একেবারে বিছানায় শুয়ে না পড়লে বুঝি খারাপ হতে পারে না।'

নীলকমল বলল, 'যাচ্ছ না কদিন ধ'রে। মা বলছিলেন তোমার কথা। উমুও —'

সরিৎ একটুকাল চুপ ক'রে রইল, তারপর বলল, 'একটা কথা কদিন ধ'রেই তোমাকে বলব ভাবছি নীলু।'

নীলকমল উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলুক, সরিৎ নিজেই বলুক। ও বললেই ভালো হয় সব চেয়ে।

সরিৎ বই বন্ধ ক'রে 'আমার কিছুকাল ওদিকে না যাওয়াই ভালো — নীলু।'

নীলকমল চমকে উঠে বলল, 'তার মানে?'

সরিৎ বলল, 'জানো তো মেয়েদের মন? আর জানো তো তোমার সব বন্ধু আর পাড়াপড়শীর মুখ? এরই মধ্যে মুখে মুখে নানা কথা ছড়াতে সুরু হয়েছে।'

নীলকমলই এ কথাগুলি বলবে ভেবেছিল। কিন্তু সরিৎ আগেই বলে ফেলল।

নীলকমল বলল, 'যাতে আর না ছড়ায় সে ব্যবস্থা তো আমরা যে কোন সময়ে করতে পারি।'

সরিৎ বলল, 'তাইতো করছি, যাতায়াত বন্ধ রাখলেই তোমার বন্ধুদের উৎসাহ কমে আসবে। ইতিমধ্যে উমুর একটা সম্বন্ধ টম্বন্ধ —'

নীলকমল বলল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ সরিৎ?'

সরিৎ ঘাড় নাড়ল, 'ঠাট্টা? এর মধ্যে ঠাট্টার কথা কি উঠল? উমুকে আমরা দুজনেই স্নেহ করি। ওর মঙ্গলামঙ্গল কারো কাছেই হাসি ঠাট্টার বস্তু নয়।'

নীলকমল এবার যেন আশ্বস্ত হোল, 'তাহলে তোমার মত আছে বিয়েতে? তুমি ওকে বিয়ে করছ?'

সরিৎ যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'আমি! তুমি বলছ কি নীলু। শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব থেকে কুটুম্বিতা! না ভাই, ওসব আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

নীলকমল রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'সম্ভব নয়! বন্ধু হয়ে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের এমন সর্বনাশ করলে!'

সরিৎ কেস থেকে সিগারেট বের ক'রে একটা দিল বন্ধুর হাতে, আর একটা নিজে ধরাল, তারপর বলল, 'তোমার অত খানি বিচলিত হবার কোন কারণ নেই নীলু। ইচ্ছা করলে তুমি উমুকেও সব জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পার।'

নীলকমল সে কথায় কান দিলনা। উত্তেজিত স্বরে বলল,

'ঠাণ্ডা মাথায় তুমি যে এমন শয়তানি করবে আমাদের সঙ্গে —'

সরিৎ একটু হাসল, 'এতদিন তোমাদের মাথাও ঠাণ্ডা ছিল। আজ কেবল গরম হয়েছে। ফের যখন ঠাণ্ডা হবে তখন ভেবে দেখ, তোমরা যা চাইছ তা কিছুতেই সম্ভব নয়।'

নীলকমল মুখ কালো ক'রে বলল, 'আচ্ছা, কথাগুলি মনে রেখ।'

সরিৎ বলল, 'রাখব বই কি। নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলেও পুরোন সম্পর্ক তো আমাদের রইলই।'

বাড়িতে ফিরে এসে সব কথাই খুলে বলেছিল নীলকমল। কিছুই গোপন করেনি। উর্মিলা নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করেছিল। সারদাবাবু খবরের কাগজে মুখ ঢেকে সংক্ষেপে মন্তব্য করেছিলেন, 'যা ইচ্ছা কর তোমাদের, আমি কিছুর মধ্যে নেই। এমন যে হবে তা আমি আগেই জানতুম।'

নিভাননী জ্বলে উঠলেন, 'ঢং কোরো না। জানতেই যদি — বাধা দাওনি কেন ?'

সারদাবাবু তেমনি নিরুত্তেজ গলায় জবাব দিলেন, 'বাধা দিতে গেলে কি কেউ শুনতে ? আমার কোন কথাটা তোমরা শোন ? টাকা জোগাবার কল ছাড়া আর কি মনে কর তোমরা আমাকে ?'

নিভাননী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'ঈস, কেবল টাকা, টাকা, টাকা! কত টাকা রোজগার করেছ শুনি? টাকা দিয়ে একেবারে ঢেকে রেখেছে সংসার, না?'

তারপর ছেলের দিকে ফিরে বললেন, 'খবরদার! ফের যদি তোর কোন বন্ধু এসে আমার বৈঠকখানায় আড্ডা দেয়, আর ফের যদি ঊর্মিলা পা বাড়ায় নিচের ঘরে, আমি —' তারপর হঠাৎ যেন কোন কথা খুঁজে পেলেন না নিভাননী, বললেন, 'আমি তোদের জ্বালায় আত্মহত্যা ক'রে মরব!'

দোর দেওয়া ছোট ঘরটুকুর মধ্যে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে ঊর্মিলারও আত্মহত্যার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু দাদার ঠেলাঠেলিতে দোর শেষ পর্যন্ত খুলতে হ'ল ঊর্মিলাকে।

নীলকমল তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে অপরাধীর সুরে বলল, 'তোর কোন দোষ নেই উমু। সব দোষ আমার। আমিই বুঝতে পারিনি, আমিই চিনতে পারিনি সরিৎকে। কিন্তু শোধ আমি এর নেবই।'

ঊর্মিলা কোন কথা বলল না। ভিজে বালিশের মধ্যে তেমনি চুপ ক'রে রইল।

কিন্তু চুপ ক'রে বেশিদিন থাকতে পারলেন না নিভাননী। মেয়েকে বলে বলে হয়রান হয়ে তিনি নিজে সরিৎকে একখানা চিঠি লিখলেন। জবাব না দেওয়ায় গোপনে গোপনে একবার সাক্ষাতের চেষ্টাও করলেন, কিন্তু সরিৎ কিছুতেই আর তাঁর

৩

সামনে এল না। তবু নিভাননী নিশ্চেষ্ট রইলেন না। স্বামীকে গিয়ে বললেন, 'হাত পা গুটিয়ে অমন চুপচাপ বসেই থাকবে নাকি সারাদিন ?'

সারদাবাবু বললেন, 'সারাদিন আমি বুঝি বসেই থাকি ?'

নিভাননী বললেন, 'তা ছাড়া কি। ট্রাম বাসে বসে বসে যাও, আপিসে গিয়ে ফ্যানের নিচে বস, তারপর বাড়িতে ফিরে এসে একেবারে টান টান হয়ে পড়। কিন্তু মেয়ের ওপর তোমার কি কোন কর্তব্য নেই ?'

সারদাবাবু মৃদু হাসলেন, 'তোমাদের কর্তব্য বুঝি শেষ হোল এতদিনে ?' তারপর খবরের কাগজের পাত্রপাত্রীর স্তম্ভের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'সব কর্তব্য তো টাকার সঙ্গে। তার একটা ব্যবস্থা না করে ছট্ ফট্ ক'রে লাভ কি ? আগের দুই মেয়ের বিয়ের দেনাইতো এখনো সব শোধ হয়নি।'

নিভাননী বললেন, 'তোমার মুখে তো টাকার খোঁচা ছাড়া কথা নেই। পুরুষ হয়ে সংসারে যেন কেবল তুমিই টাকা রোজগার ক'রে ছেলেমেয়ে পরিবারকে খাইয়েছ, আর কেউ তা কোনদিন করেনি। বেশ, উমুর বিয়ের কথা তোমাকে আমি আর কোনদিন বলতে যাবনা। তোমার যা চিত্তে লয় করো।'

স্বামীর কাছ থেকে ছেলের কাছে গেলেন নিভাননী,

বললেন, 'সরিতের অপমানটা এমন চুপ চাপ সহ্য করবি? কোন প্রতিকার করবি না?'

সরিতের বাড়ি থেকে সেদিন মেজাজ গরম ক'রে ফিরে এলেও বিষয়টা পরে নীলকমল ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছে। অন্যান্য বন্ধুদের উস্কানি সত্ত্বেও এ নিয়ে হৈ চৈ করাটা যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, তা বুঝতে বাকি ছিল না নীলকমলের। আপাতত সরিতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখাই ভালো। পরে নিজে সবল হয়ে সুযোগ সুবিধামত শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে তোলা যাবে। এখন এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে গেলে, নিজেদের ঘরের কথা, নিজের বোনের দুর্বলতার কথাটাই বেশি ছড়িয়ে পড়বে। সরিৎদের তেতলা বাড়ির ঘরের দিকে তাকিয়ে থুথু ছিটাতে গেলে তা নিজেদেরই গায়ে এসে লাগবে।

নিভাননী বললেন, 'তুই আর আমাকে জ্বালাসনে নীলু। বিয়ে দেব আমরা। তাতে ওর আবার একটা মতামত কিসের? ছেলে কানাখোঁড়া, অকাট মূর্খ কিছু একটা না হয়, মোটামুটি ভদ্রলোকের ছেলের মত হয় দেখতে শুনতে, সংসার চালাবার মত চাকরি বাকরি যাহোক কিছু করে, তাহলেই হোল। আর বেশি বাছাবাছিতে কাজ নেই আমার, আর উঁচু নজরে দরকার নেই, ঢের শিক্ষা হয়ে গেছে।'

নীলকমল বলল, 'তা তো হোল। কিন্তু টাকা? যেমন

তেমন ক'রে বিয়ে দিতে গেলেও তো অন্তত হাজার দুই আড়াইর কমে হবে না বিয়ে।'

নিভাননী বললেন, 'নাই বা হোল, তোর মত এম, এ, পাশ একজন ছেলের পক্ষে আড়াই হাজার টাকা যোগাড় করা খুব কঠিন নাকি? কম ক'রে হোলেও হাজার খানেক টাকা পণ তো তুইও যে কোন মেয়েকে বিয়ে করলেই পাস।'

নীলকমল বলল, 'আমি বিয়ে করব! তুমি বল কি, মা?'

নিভাননী বললেন, 'করবিই তো। না করলে বোনের বিয়ে দিবি কি ক'রে? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, যেমন করেই হোক তিন মাসের মধ্যে উমুর বিয়ে আমি দেবই। সরিৎকে দেখাব, সে ছাড়াও ছেলে আছে বাংলাদেশে। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা আমি তোর ভরসাতেই করেছি নীলু। কেবল মেয়েই তো নয়, ছেলেও তো পেটে ধরেছি আমি, না কি ধরিনি?'

নিভাননী দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন ছেলের। চোখ দুটো তাঁর ছল ছল করে উঠল।

এমন প্রস্তাব নিভাননী আরও দু একবার দিয়েছেন। কিন্তু এমন ভাষায় নয়, এমন ভঙ্গিতে, নয়, এমন উপলক্ষ্যে নয়। নীলকমলের হৃদয় দুলে উঠল, ভাবাবেগে আর্দ্র হোল গলা, নীলকমল বলল, 'তুমি ভেবনা মা। তোমার প্রতিজ্ঞা আমারও প্রতিজ্ঞা।'

নীলকমলের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে বাড়ির কারোরই কোন উচ্চ ধারণা নেই। শুধু তার বাবা মা'ই নয়, কাকীমা, খুড়তুতো ভাই দুটি, নিজের বোনেরা, সবাই নীলকমলকে অকর্মণ্য বলে জানে। স্কুল কলেজে পরীক্ষায় ভালো পাশ করতে পারেনি নীলকমল। থেমে থেমে পরীক্ষা না দিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোন রকমে বেরুতে পেরেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চাকরিতে ঢোকা নিয়ে আবার সেই গোলমাল। ঠিক ঢোকা নিয়ে নয়, ঢুকতে বেশি কষ্ট হয় না। লম্বায়, চওড়ায়, ফর্সা রঙে, মুখের গড়নে, নাক চোখের তীক্ষ্ণতায়, চেহারাটা বেশ সুন্দর নীলকমলের, কথাবার্তাও বেশ চটপট বলতে পারে। ইন্টারভিউর চৌকাঠটা বেশ সসম্মানেই পার হয়ে যায় নীলকমল। কিন্তু ভিতরে গিয়ে মন বসে না। কাজকর্ম ভালো লাগে না। দিন কয়েক যেতে না যেতেই নীলকমল পালাই পালাই করতে থাকে। আর শেষ পর্যন্ত পালায়ও। কোন কোন অফিস নিজে ছাড়ে, কোন কোন অফিসের মালিকপক্ষ ছাড়িয়ে দেন। কিন্তু নীলকমলের তাতে কোন ক্ষোভ নেই। এক গাদা টেবিল চেয়ার আর একপাল মুখশুকনো লোকের ঘর থেকে যে সে বেরিয়ে আসতে পেরেছে তাই যেন তার পরম সৌভাগ্য। বেরোতে না পারলে চার দিকের দেওয়ালগুলি যেন তাকে পিষে মারত। কিন্তু নীলকমলের বাবা মা ব্যাপারটাকে ঠিক সে চোখে দেখতে পারেন না। তাঁরা ছেলেকে গালাগাল

দেন, নিজেদের অদৃষ্টকে দোষারোপ করেন, নিভাননী বলেন, 'উনি চোখ বুজলে কি দশা হবে সংসারের তা ভাবলে আমার বুক কাঁপে।'

তা শুনে সারদারঞ্জন মন্তব্য করেন, 'চোখ খোলা থাকতেই যে দশা দেখছি তাতে চোখ যত তাড়াতাড়ি বুজি ততই ভালো।'

ফলে চেষ্টা চরিত্র ক'রে আবার কোন অফিসে ঢুকে পড়তে হয় নীলকমলকে। তারপর ঢুকে আবার বেরুবার জন্য হাঁস-ফাস করতে থাকে। বাড়ির লোকজনেরও সে কথা বুঝতে বকি থাকে না। সবাই জানে নীলকমলের চাকরি হওয়া আর চাকরি যাওয়ার মধ্যে সামান্যই পার্থক্য।

এরকম অবস্থায় বিয়ের কথা মোটেই চিন্তা করেনি নীলকমল। বিয়ে সে কোনদিন করবে না এইটাই মনে মনে ভেবে রেখেছিল, মুখেও তাই বলত। কিন্তু নিভাননী যখন তার হাত চেপে ধরলেন, বললেন তার মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, কথাটা যেন নতুন লাগল নীলকমলের কানে। তাহলে কিছু না কিছুর জন্য সেও নির্ভরযোগ্য। কোন না কোন কাজ তাহলে সেও করতে পারে। বিয়ে কথাটার মানেই যেন আমূল বদলে গেল। বিয়ে মানে শুধু টুকটুকে মুখ একটি বউ ঘরে নিয়ে আসা নয়, বিয়ে মানে মায়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সহায়তা করা, বন্ধুর কৃতঘ্নতার প্রতিকারে

উদ্যোগী হওয়া। বিয়ে মানে যে সমাজ তাদের বিড়ম্বিত করেছে, সেই সমাজের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া, মাছের তেলে মাছ ভাজা। বিয়ের এতগুলি অর্থ আবিষ্কার ক'রে মনে মনে ভারি উৎফুল্ল হয়ে উঠল নীলকমল। যে রঙীন মধুর লজ্জা সংকোচের পাতলা আবরণে জড়ানো ছিল বিয়ে কথাটা, যার জন্য নীলকমলের নিজেরই কুণ্ঠার শেষ ছিল না, সে আবরণ ছিঁড়ে ফেলতে পেরে নীলকমল উল্লসিত হোল।

ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি ঊর্মিলার কাছে সব খুলে বলল নীলকমল। বয়সে, শিক্ষাদীক্ষায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে ঊর্মিলা অনেক ছোট হলেও হঠাৎ নীলকমলের মনে হোল, ব্যর্থ প্রেমে, দুঃখে, বঞ্চনায় ঊর্মিলার গুরুত্ব যেন অনেক বেড়ে গেছে। ঊর্মিলা যেন আর শুধু ছোট বোন নয়; বন্ধু হারিয়ে বোনের মধ্যে বন্ধুকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করল নীলকমল।

অবশ্য খানিকটা বন্ধুত্ব গোড়া থেকেই ছিল। দেখতে সুন্দরী নয় বলে ঊর্মিলার বিয়ে হয় না, আর ভিতরে যোগ্যতা নেই বলে নীলকমলের চাকরি থাকে না। পরিবারের সকলের কাছে, পাড়াপড়শী স্বজন বন্ধুদের কাছে, দুই ভাই বোনের মর্যাদার বিশেষ তারতম্য ছিল না। কোণঠাসা ছিল দুজনেই। সেই কোণের মিল থেকে মনের মিল। ঊর্মিলা দাদার ফ্লাস্ক চায়ে ভরে রাখে, হিসাব রাখে লণ্ড্রীতে দেওয়া জামা-কাপড়ের, বিছানা ঝাড়ে, ঘর গুছোয়, র‍্যাক গুছোয়, টেবিল গুছোয়। আর

নীলকমল বোনকে নভেল নাটক পড়তে দেয়, সিনেমায় যায় সঙ্গে নিয়ে, সঙ্গে ক'রে দোকানে নিয়ে কোন বার পকেটের অবস্থা আর পছন্দে মিলিয়ে উর্মিলার জন্য একখানা শাড়ি কেনে, কোনদিন বা কিছু টয়লেট। গোঁড়া পরিবারের গণ্ডী ভেঙে আধুনিকতার আলো দেখতে দেয় বোনকে, আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয় নিজের ঘনিষ্ঠ দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে। দু'জন পরস্পরের পরিপূরক। তারপর সরিৎ যখন বঞ্চনা করল, সে লাঞ্ছনা, সে অপমান আঘাত করল দুজনেরই মনে। আরো কাছাকাছি, আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল দুই ভাই বোন।

দাদার মতলব শুনে উর্মিলা বলল, 'তোমাদের প্রতিজ্ঞার মত মনে মনে আমারও একটা প্রতিজ্ঞা কিন্তু আছে দাদা।'

নীলকমল বলল, 'কি প্রতিজ্ঞা।'

উর্মিলা বলল, 'বিয়ে কোন দিন করব না।'

নীলকমল বলল, 'নিশ্চয়ই করবি।'

'নিশ্চয়ই করব? তোমরা কি জোর ক'রে আমার বিয়ে দেবে নাকি?'

নীলকমল জবাব দিল, 'আমরা জোর ক'রে দেব না, তুই জোর ক'রে করবি। নইলে লোকে ভাববে একটা হতভাগা প্রবঞ্চকের ধ্যান করছিস তুই। বিয়ে তুই করলিনে একথা লোকে ভাববে না, মনে করবে কলঙ্কের জন্য বিয়ে তোর হোলো না, বিয়ে আমরা তোর দিতে পারলাম না। দূরে

বসে মজা দেখবে সরিৎ, ফ্ল্যাটার্ড হবে। তা আমরা তাকে হতে দেব না। মজা দেখতে দেব না কাউকে, পারি তো মজা দেখাব।'

দাদার সঙ্গে ঠিক একমত যে হোল ঊর্মিলা, তা নয়। কিন্তু কথাগুলি বেশ উপভোগ করল। চোখের জলে ভিজে গোটা দুনিয়া যেন স্যাঁৎসেতে হয়ে গিয়েছিল, সেখানে হঠাৎ কড়া রোদ উঠেছে। সে রোদের তাপ আছে, দাহ আছে তবু জল বৃষ্টির চেয়ে অনেক ভালো। অনেকদিন পরে জিভে যেন নতুন ক'রে নূন ঝালের স্বাদ লাগল ঊর্মিলার। ঝাঁজটা উপভোগ্য লাগল।

ঊর্মিলা বলল, 'বেশ, আমার বিয়ের কথা পরে। তার আগে তোমার বিয়ে দেখি।'

নীলকমল হাসল, 'আমার বিয়েটা অধিবাস, আসলে তোর বিয়েটাই বিয়ে। সে বিয়ে কেবল দেখবি না, দেখাবিও।'

ঊর্মিলা বলল, 'কাকে ?'

নীলকমল জবাব দিল, 'সরিৎকে। নিমন্ত্রণের চিঠি দিয়ে। সেই জন্যই তো বিয়ে।'

ঊর্মিলা হাসল, 'বেশ। তোমার বিয়ের চিঠি দিয়েই সুরু হোক। চিঠির খসড়াটা কিন্তু আমি করব দাদা।'

নীলকমল বলল, 'করিস, কেবল খসড়া কেন, প্রেসে গিয়ে

নিজের হাতে ইচ্ছা হয় তো কম্পোজ ক'রে মেসিনে ছেপেও দিতে পারিস।'

দাদার কথার ভঙ্গিতে উর্মিলা আর একবার হাসল, 'পরের প্রেসে গিয়ে আর দরকার কি? বিয়ের চিঠি ছাপবার জন্য তার চেয়ে নিজেই ছোটখাট একটা প্রেস ক'রে দাও দাদা।'

নীলকমলও হাসল, 'দরকার হলে তাও করব।'

তারপর সত্যি সত্যিই নীলকমল প্রচার করল বন্ধুবান্ধবের কাছে, বক্স নম্বর দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল, সুদর্শন, এম, এ, পাশ উপার্জনক্ষম চাটুয্যে ছেলের জন্য পাত্রী চাই। যৌতুক চাই না, কিন্তু নগদ চাই পাঁচ হাজার!'

বিজ্ঞপ্তিটা আরো বিশদ হোল বন্ধুদের কাছে, 'কেবল নগদ। অলঙ্কার নয়, আসবাব নয়, ঘড়ি নয়, পেন নয়. শুধু টাকা চাই। মেয়ের রূপ চাইনে, গুণ চাইনে, কুল চাইনে, বয়স চাইনে। মেয়ে কালো হোক, কুৎসিত হোক, কানা হোক, খোঁড়া হোক কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু টাকায় সব ক্ষতিপূরণ ক'রে দিতে হবে।'

বন্ধুরা অবাক হয়ে গেল। কেউ কেউ বলল, 'ব্যাপার কি, যুদ্ধের বাজারে তুমিও কি ব্যবসায় নামবে নাকি নীলকমল।'

নীলকমল বলল, 'ব্যবসাই বটে। কিন্তু কেবল বিয়ের ব্যবসা।'

কাগজের অফিস থেকে মোটা মোটা এনভেলপ আসতে

লাগল নীলকমলের নামে। পাত্রীর রূপগুণের, বিদ্যাবুদ্ধির বর্ণনা, চেহারার প্রতিকৃতি। অভিভাবকেরা আলাপ সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত, পত্রালাপের প্রত্যাশী।

নীলকমল বোনকে বলল, 'তুই আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী। যা করবি কর।'

ঊর্মিলা বলব, 'আমি কিন্তু বেছে বেছে কানা খোঁড়ার সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব দাদা।'

নীলকমল বলল, 'কানা খোঁড়াই তো চাই। কানা খোঁড়া না হলে কানা খোঁড়া বানিয়ে নেব।'

কিন্তু ফটো বেছে বেছে ঊর্মিলা যাকে পছন্দ করল সে কানাও নয়, খোঁড়াও নয়। চোখ দুটি পদ্মপলাশের মত না হলেও বেশ বড় বড়, কালো কালো। দলবল নিয়ে ঊর্মিলা তার চলনও দেখেও এল। ভবানীপুরের শাঁখারীটোলা লেনের নিরঞ্জন বাঁড়ুয্যের মেয়ে মণিমালা। নিরঞ্জনবাবু ও অঞ্চলের বিশিষ্ট ডাক্তার। অবস্থা ভালো। মণিমালাও দেখতে সুন্দরী, ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলেজে ঢুকেছে। কিন্তু পছন্দমত সম্বন্ধ পেলে নিরঞ্জনবাবু মেয়ের বিয়েই দিয়ে দেবেন, পড়াবেন না। নীলকমলের চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে পছন্দই হোল নিরঞ্জন বাবুর। চালাক চতুর আছে ছেলেটি। টাটা এয়ার-ক্রাফটে পৌনে দুশো পাচ্ছে কিন্তু গ্রেড সাতশর। উন্নতির আশা আছে ভবিষ্যতে। বাড়ি টাড়ি অবশ্য নেই, ভাড়াটে

বাড়িতেই থাকে। কিন্তু অত দেখলে চলবে না। ভাগ্যে থাকে তো বাড়ি মেয়ের পরেও হতে পারবে। মেয়ে তো এই একটি নয়, আরো তিনটি আছে মণিমালার পরে। নীলকমলের পাঁচ হাজারের দাবী অবশ্য টিকল না। নগদ নামল এক হাজার একে। কিন্তু শাড়ি গয়নায়, আসবাবপত্রে, সেতার, হারমনিয়ম, সেলাইর কলে, নীলকমলের ঘড়ি, পেনে নিরঞ্জন বাবুর ব্যয় পাঁচ হাজার ডিঙিয়ে গেল।

নীলকমল আপত্তি করেছিল, সে এসব চায় না।

কিন্তু ঊর্মিলা জোর ক'রে বলল, 'আমরা চাই।'

সারদাবাবু আর নিভাননীও মেয়ের সঙ্গে সুর মেলালেন। শুধু টাকা দিয়ে কি হবে? ভদ্রবংশের, উঁচু ঘরের বেশ সুন্দরী, শিক্ষিতা, ঘর আলো করা, একটি বউ আসুক বাড়িতে। বহুকাল বাদে একটু খুশির হাওয়া লাগুক, আনন্দ উৎসবের সুর শোনা যাক। উমুর বিয়ের জন্য ভাবনা কি? হাজার খানেক নগদ তো মিলছেই। আর হাজারদেড়েক মেয়ের জন্য গোপনে গোপনে সঞ্চয় করেছেন সারদাবাবু। মনের আনন্দে তথ্যটা তিনি স্ত্রী, পুত্র আর মেয়ের কাছে এবার প্রকাশ করলেন। লাইফ ইনসিওরেন্সের তহবিল থেকেও সাত-আটশ টাকা ধার না নেওয়া যাবে তা নয়! বাবার যেন নতুন রূপ দেখল ঊর্মিলা আর নীলকমল! বিয়ের বাজারে ছেলের মূল্য চড়ে যাওয়ায় মনের উৎসাহে ঔদাসীন্য, নিস্পৃহতা,

অসহযোগের খোলস ছেড়ে হঠাৎ যেন সংসারের মাঝখানে নেমে এসেছেন সারদাবাবু! যোগাযোগের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সকলের দিকে।

বিয়ের পর নীলকমল বলল, 'এবার তোর একটা ব্যবস্থা করতে হয় উর্মি।'

মণিমালাও সেই সঙ্গে সুর মেলাল, 'নিশ্চয়ই। ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে যখন খাঁচায় পুরলে, তোমাকেও আর স্বাধীন-ভাবে চড়ে বেড়াতে দিচ্ছি ভেব না।'

উর্মিলা বলল, 'এই বুঝি কৃতজ্ঞতা বউদি। জানো, কনে বাছাই করবার ভার ছিল আমার ওপর। ভবানীপুরের মণিমালাকে না এনে শ্যামবাজারের সুষমা, কালীঘাটের কেতকীকে পছন্দ করে বসলে কে ঠেকাত?'

মণিমালা জবাব দিল, 'কেউ না। কিন্তু পছন্দ যে তুমি ছাড়া আরো কেউ কেউ করতে জানে সেইটাই দেখাতে চাই। এবারকার নির্বাচনের ভার আর তোমার ওপর নেই, সরে সরে আমার ওপর এসেছে। কোন আপত্তি আর শুনছি না।'

উর্মিলা বলল, 'আপত্তি আর কি! ছেলে কানা হোক, খোঁড়া হোক, কিছুতেই আপত্তি নেই। কিন্তু 'পণ চাই — পাঁচ হাজার।'

মুচকি হেসে নীলকমলের কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করল ঊর্মিলা, সস্ত্রীক নীলকমলও হাসল।

মণিমালা বলল, 'ওরে বাবা, তোমাকে পণ দিয়ে নেবে নাকি লোকে।'

ঊর্মিলা বলল, 'নিশ্চয়ই নেবে, আমি বীর্যশুল্কা। আর পুরুষের পৌরুষ আজকাল টাকায়। পাঁচহাজারের একপয়সা কমেও বিয়ে করব না। এই মোর পণ।'

নীলকমল উঠে গেলে মণিমালা বলল, 'পণের দিকে অত ঝোঁক কেন ঠাকুরঝি? আমরা মেয়েছেলে, মন পেলেই খুশি।'

ঊর্মিলা বলল, 'মন পাই কোথায়।'

মণিমালা বলল, 'পাবে, পাবে। বাবারে বাবা, তুটো দিন সবুর করো। মণে মণে মন সাপ্লাই করব তোমাকে।'

ঊর্মিলা বলল, 'তুটো দিন কেন, অনন্তকাল সবুর করতে রাজী আছি। তোমরা অস্থির হয়ো না।'

কিন্তু সবচেয়ে বেশি অস্থির হলেন নিভাননী, ছেলেকে ডেকে বললেন, 'বউভাতের নিমন্তন্ন খাওয়াতে হাজার টাকার শ' চারেক তো অমনিতেই খরচ হয়ে গেছে, আরো যদি দেরি করিস ও টাকার এক পয়সাও আর ঘরে থাকবে না।'

নীলকমল বলল, 'না মা, আর দেরি করব না।'

তারপর স্ত্রীকে বলল, 'অমন হাত পা ছেড়ে বসে থাকলে হবে না। খোঁজখবর দাও দেখি পাত্রের। অনেক সময়

মেয়েদের মারফৎই সবচেয়ে ভালো হয় ঘটকালী। মনে ক'রে দেখ তোমার জেঠতুতো, খুড়তুতো, মাসতুতো, পিসতুতো ভাইদের মধ্যে অবিবাহিত যোগ্য পাত্র কেউ আছে কি না।'

মণিমালা হেসে মাথা নাড়ল, 'না, জ্যাঠা, খুড়ো, মেসো, পিসে আমার কেউ নেই। মামাতো ভাই দুটি আছে। যিনি বড় তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে, আর যার বিয়ে হয়নি ঠাকুরঝির চাইতে সে বয়সে বছর পাঁচ-ছয়েকের ছোট হবে। কিন্তু মনুদার একটা খোঁজ নিয়ে দেখলে হয়।'

নীলকমল বলল, 'মনুদা কে?'

মণিমালা বলল, 'মনতোষ গঙ্গোপাধ্যায়। বি, এ, পাশ ক'রে চাকরি করছেন কর্পোরেশনে। ভালো চাকরি। বাড়ির অবস্থা টবস্থাও বেশ ভালো। কিন্তু ধনুর্ভাঙ্গা পণ, বিয়ে করবেন না। তাঁকে রাজী করাতে হলে ধরতে হবে হাত কাটা কাকাবাবুকেও! সবই তাঁর হাতে।'

নীলকমল বলল, 'তাঁকেও চিনতে পারলাম না।'

মণিমালা বলল, 'মনুদার মামা, সোমনাথ চক্রবর্তী। বাবার বন্ধু। সেই বিপ্লবী যুগের মানুষ। পুলিসের সঙ্গে লড়াই ক'রে একখানা হাত রেখে আসেন। তারপর একখানা হাতেও কীর্তিকাণ্ড কম করেন নি।'

নীলকমল বলল, 'সে কথা পরে শুনব। আগে চিঠিপত্র লিখে যোগাযোগ করো তাঁর সঙ্গে। কাজ যারা করে তারা

হাত না থাকলেও করে। যারা করে না তারা হাত থাকলেও করে না। দু হাত গুটিয়ে বসে থাকে।'

মণিমালা মৃদু হেসে বলল, 'যেমন তুমি।'

তারপর সোমনাথবাবুকে চিঠি লিখল মণিমালা। জবাবে তিনি নীলকমল আর মণিমালাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। অনেকদিন দেখাশোনা নেই মণির সঙ্গে। ঘটনাক্রমে তার বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাই বলে কি তার বরকেও একবার দেখতে পারবেন না?

বেরুবার সময় মণিমালা বলল, 'দিগ্বিজয়ে যাচ্ছি ঠাকুরঝি। দেখি কাউকে ধ'রে বেঁধে নিয়ে আসতে পারি নাকি।'

ঊর্মিলা বলল, 'দোহাই তোমার, তা আনতে যেয়ো না। তার দরকার নেই।'

নীলকমল ধমকের সুরে বলল, 'দরকার আছে কি না আছে তা আমরা বুঝব। নিজের হাতে নিমন্ত্রণের সেই চিঠি ছেপে দেওয়ার কথা কি ভুলে গেলি?'

ঊর্মিলা চুপ ক'রে রইল। সরিৎ তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বেশি দিন হয় নি। মাত্র মাস ছয়েক আগেকার ঘটনা। কিন্তু ইতিমধ্যে বাড়ির সবাই সে কথা যেন ভুলে যেতে বসেছে। যা দুঃখকর, যা অপ্রিয়, তা লোকে কতক্ষণই বা মনে রাখতে চায়? মণিমালা ভারি ফূর্তিবাজ, আমুদে মেয়ে। হাসিঠাট্টায়, গানে, গল্পে, বাড়ির সবাইকে অন্যমনস্ক রেখেছে। সেই আঘাত

আর অপমানের কথা কেউ প্রায় তোলেই না আজকাল, তুলে লাভ কি ? কিছুকাল আগে একবার খবর এসেছিল সরিৎও বিয়ে করেছে। ভালোবেসে বিয়ে। বালীগঞ্জবাসী কোন এক এ্যাডভোকেটের মেয়ে। জাতে কায়স্থ। অসবর্ণ বিয়েতে এ্যাডভোকেট নাকি মত দেন নি। কিন্তু আইন-আদালতের সম্মতি পাওয়া গেছে। নীলকমলের আর এক বন্ধু সুরেন গল্প করেছিল, চমৎকার নাকি দেখতে সরিতের স্ত্রী। নাম পর্ণা, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। টানা টানা নাক চোখ। কেবল দেখতেই সুন্দরী নয়, বিদুষী বলেও শোনা গেছে। বি, এ, পাশ করেছে বছর ছয়েক আগে। এম, এ, টাও বোধ হয় এবার দিয়ে ফেলবে।

এ সংবাদে বাড়ির সবাই আরো একবার চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বিশেষত নীলকমল। বলেছিল, 'এর শোধ নিতেই হবে।' কিন্তু কি ক'রে যে শোধ নেওয়া যায় তার পরিকল্পনা করতে করতে শোধ নেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তারপর মণিমালা এসে সব প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছে। ঊর্মিলাও যেন আর মনে রাখতে চায় না, মন থেকে মুছে ফেলতেই চায়।

কেবল সাজতেই যে ভালোবাসে মণিমালা তাই নয়, সাজাতেও জানে। বিকালের প্রসাধনপর্বে ঊর্মিলাকেও যোগ দিতে হয় বউদির সঙ্গে। না গেলে মণিমালা তাকে টানাটানি

ক'রে নিয়ে যায়। বলে, 'মাথার অত চুল কি জট পাকাবার জন্য রেখেছ ঠাকুরঝি? তার চেয়ে একেবারে ন্যাড়া ক'রে ফেল ভাই। বাসা বাঁধবার জন্য মাথাটাকে যে উকুনদের ভাড়া দিয়ে রাখবে তা হবে না। ভেবেছ তোমার মাথার উকুন আমার মাথায় আসবে আর সারা রাত কুট কুট ক'রে কামড়াবে! জেনে শুনে তা হতে দিনে পারিনে।

চুল বাঁধা হয়ে গেলে স্নো পাউডার মাখা আর আলতা পরার পালা।

ঊর্মিলা যদি আপত্তি করে, 'ওসব থাক বউদি। ওসব আমার জন্য নয়। ওসব আমাকে মানায় না।' মণিমালা মুখ ভার ক'রে জবাব দেয়, 'তাহলে আমাকেও মানায় না। পড়ে থাক সব।'

কোন দিন বলে, 'আচ্ছা মানায় কি না মানায় একবার দেখই না আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। এমন মেয়ে নেই যে তেল সিন্দুরে সুন্দর হয় না।'

কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা নয় তা মণিমালাকে দেখেই ঊর্মিলা বুঝতে পারে। বিয়ের পর মণিমালার রূপ যেন আরো খুলেছে। হাসিতে খুসিতে সত্যিই ভারি চমৎকার দেখায় তাকে। মণিমালা বলে, 'তুমি যদি অমন মুখ ভার ক'রে রাখ ঠাকুরঝি, নিজেকে যেন কেবল অপরাধী অপরাধী লাগে।'

ঊর্মিলা বুঝতে পারে, কথাটা উল্টো ক'রে বলতে চায়

মণিমালা। এমন আনন্দের সংসারে মুখ ভার ক'রে যে দুঃখের ভার বয়ে বেড়ায় অপরাধটা তারই। ঊর্মিলা কিছুদিন জোর ক'রেই মণিমালার হাসি ঠাট্টায়, গান বাজনায় যোগ দিতে চেষ্টা করে, তারপর আর চেষ্টা করার দরকার হয় না। ইচ্ছা ক'রেই যোগ দেয়।

মণিমালা বলে, 'এই তো সুবুদ্ধি হয়েছে মেয়ের। এবার বিয়ে হলে বুদ্ধি আরো পাকবে।'

ঊর্মিলা হাসে, 'তুমি বোধ হয় বিয়ের আগেই পেকেছিলে বউদি।'

মণিমালা অস্বীকার করেনা, বলে, 'তা পেকেছিলাম বইকি। পেকে বোঁটার সঙ্গে আলগা আলগা ভাবে লেগেছিলাম আর কেবল তাকাচ্ছিলাম নিচের দিকে, কার হাতে খসে পড়ব, কার হাতে খসে পড়ব।' তারপর মণিমালা একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে ঊর্মিলার, 'তুমিও এবারে খসে পড় ভাই। অমন বোঁটা আঁকড়ে শুকিয়ে যেয়ো না। গাছের তলায় মানুষ তো ভাই একজন নয়, হাজার জন। তাদের হাজার জোড়া হাত। হাত পা ছেড়ে দাও, কারো না কারো হাতে পড়বেই। পড়েই সুখ, ডাল ধ'রে ঝুলে থেকে সুখ নেই।'

স্বামী পেয়ে খুবই যে খুশি হয়েছে মণিমালা তাতে সন্দেহ নেই। তার মনের আনন্দ যেন একটু একটু ক'রে ঊর্মিলার মনেও সঞ্চারিত হতে থাকে। ঊর্মিলা বলে, 'যে কোন একজনের

হাতে পড়লেই হোল বুঝি? এমন সুন্দর একখানা হাতে পড়েছ কিনা তাই আনন্দ আর ধরেনা মনের।'

মণিমালা জবাব দেয়, 'আহাহা, কি ভাই-গরবী বোনই না একখানা হয়েছে। তোমার দাদার মত সুপুরুষ যেন আর নেই জগতে। শোন তবে বলি! ভাগ্যগুণে হাতখানা যে সুন্দরই মিলে গেছে তা অস্বীকার করিনে। কিন্তু একটু কম সুন্দর হলেও যে আপশোষে একেবারে মরে যেতাম তা ভেব না। দূর থেকে দেখলেই ভালো মন্দ! একেবারে কাছে, একেবারে হাতের মধ্যে সব হাতই সুন্দর। হাতের কালো ধলায়, সরু মোটায় কিছু আসে যায় না ঠাকুর ঝি; হাতের আদর নিয়ে কথা। তাই পেলেই হোল।'

উর্মিলা হেসে বলে, 'যার তার হাতে আমাকে গছিয়ে দেবে বলেই বুঝি তোমার এসব যুক্তি বউদি?'

মণিমালাও হাসে, 'তা ছাড়া কি! যত সস্তায় পারি। হাতেই যে দিতে হবে তারই বা কি মানে আছে? হাত থাকে তো ভালো, না হলে একেবারে কাঁধে উঠিয়ে দেব, সে আরো ভালো।'

তাই নীলকমল আর মণিমালা যখন সম্বন্ধ খুঁজতে বেরুল, তখন উর্মিলা ঠিক জোর করে বাধা দিতে পারল। এই উপলক্ষ্যে দুজনে আর একবার একসঙ্গে বেরুচ্ছে, বেরোক। দুজনকে একসঙ্গে চলতে দেখলে ভালোই লাগে।

কিন্তু নীলকমল ফিরে এল অন্য খবর নিয়ে, 'সোমনাথবাবুর বাড়িতে একটা জিনিস দেখে এলাম উর্মি। একেবারে আস্ত নয়, একটু ভাঙা চোরাই। কিন্তু পাওয়া যায় খুব সস্তায়।'

উর্মিলা মণিমালার দিকে ফিরে মৃদুস্বরে বলল, 'আমার জন্য তো সস্তা জিনিস খুঁজতেই বেরিয়েছিলে তোমরা।'

কিন্তু উর্মিলার ঠাট্টায় কোন জবাব দিল না মণিমালা, মুখ ভার ক'রে বলল, 'তোমার দাদার কাণ্ড কাহিনী তার নিজের মুখ থেকেই শোন ভাই। আমি কিচ্ছু জানিনে। এমন খামখেয়ালী মানুষ আমি আর দুটি দেখিনি দুনিয়ায়।'

উর্মিলা হেসে বলল, 'সে কথা তো অনেকদিন শুনেছি। এবার ব্যাপারটা কি শুনি।'

মণিমালা বলল, 'দায় পড়েছে। যিনি শোনাবার তিনিই শোনাবেন। তোমরাই বলো শোন, আমি কাপড় টাপড় বদলাই গিয়ে।' মণিমালা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আর উর্মিলার ঘরে বসে আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্তটাই বলে গেল নীলকমল। সোমনাথবাবুর ভাগ্নে কিছুতেই বিয়ে করবে না। তাকে রাজী করান সম্ভব নয়। তবে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের আরো অনেক ছেলে আছে তাঁর জানা শোনা। তাদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে আলাপ পরিচয় যোগাযোগ করবেন। বিয়ের জন্য ভাবনা কি? বিয়েটাতো আজকাল আর মধ্যবিত্ত ঘরে আসল সমস্যা নয়, কন্যাদায়ের কথা ভাববার অবসর কই

মানুষের, অন্নচিন্তাই চমৎকার। যারা বিয়ে দেবে তাদেরও, যারা বিয়ে করবে তাদের আরো বেশি। কোন ভরসায় বিয়ে করবে ছেলেরা? কেবল সোমনাথবাবুর ভাগ্নে নয়, আরো অনেকেই যে বিয়ের কথায় ঘাড় নাড়ে তাতে দোষ দেওয়া যায় না তাদের। ঘাড় শক্ত না হলে বোঝা মাথায় নেবে কি ক'রে? আর আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েছেলে এখন পর্যন্ত বোঝা ছাড়া কি? পাল্কীর চলন দেশ থেকে প্রায় উঠে গেছে, কিন্তু তাই বলে আরোহিণীরা তো আর সঙ্গে সঙ্গে নামতে পারে নি। এখনো চলেছে কাঁধ বদলাবার পালা। বাপ ভাইয়ের কাঁধ থেকে স্বামী পুত্রের কাঁধে। নিজে বিয়ে করেননি সোমনাথবাবু। নীলকমলের সাহসকে তিনি ধন্যবাদ দিলেন। একটু বিদ্রূপ ক'রে বললেন, দুঃসাহস। খানিকটা সিনিক হবারই কথা। জীবনে কোন কিছু ক'রে সার্থক হতে পারেন নি। জেল থেকে বেরিয়ে এসে রাজনীতির সঙ্গেও প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বার বার দল অদলবদল করেছেন, শেষ পর্যন্ত কোন দলের সঙ্গেই মত মেলেনি। রাজনীতি থেকে অর্থনীতি। তাতেও অনেক কিছু করে দেখেছেন। সার্থকতার পরিমাণ বাড়েনি। জন কয়েক বন্ধু মিলে একটা কটন মিলের পরিকল্পনা করেছিলেন, হয় নি। খুলেছিলেন একটা প্রেস, পাবলিকেশন রাইট নিয়ে বইপত্র বেরও করেছিলেন দু' একখানা, তাও ভেঙ্গেচুরে গেছে।

নীলকমল বলল, 'কিন্তু গেলেও কিছু কিছু জিনিস এখনো ওঁর বাড়িতে রয়েছে দেখলাম উর্মি। একটা ট্রেড্‌ল্‌ মেসিন আছে। টাইপ কেসটেসও কিছু কিছু আছে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায়। একেবারে আমার মতই অসহায় অগোছাল মানুষ। কিন্তু ভুল বললুম। আমি অগোছাল হলেও ওঁর মত অসহায় না। আমার সহায় আছিস তুই, গুছিয়ে দেওয়ার জন্য তুই রয়েছিস।'

ঊর্মিলা বলল, 'এই সঙ্গে বউদিরও নাম করো দাদা। মাথায় একটু খাটো হলেও কানে মোটেই খাটো নয়। কোত্থেকে শুনে টুনে ফেলবে।'

নীলকমল বলল, 'ঠাট্টার কথা নয়। আমি জিজ্ঞেস করলুম, জিনিসগুলি এ ভাবে রেখেছেন কেন? ফের প্রেস চালাবার ইচ্ছা আছে নাকি? সোমনাথবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'চালাই যদি অন্য কিছু চালাব। ফেল করা ক্লাসে দ্বিতীয়বার পড়িনি, ফেল করা কাজে দ্বিতীয়বার হাত দেওয়ার অভ্যাস নেই আমার। অধ্যবসায় নেই বলেই তো কিছু হোল না।'

নীলকমল তখন একটু ইতস্তত ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিল, জিনিসগুলি সোমনাথবাবুর বেচে দেওয়ার ইচ্ছা আছে কিনা। নীলকমলের দু' একজন বন্ধু আছে যারা কিনবার জন্য উৎসুক। ভারি উৎসাহ তাদের প্রেস সম্বন্ধে।

সোমনাথবাবু হেসে বলেছিলেন, 'সেই দু'একজনের

একজনকে তো চোখের সামনে দেখছি। এক কালে বনেদী ঘরের ছেলে ছিলুম বাবাজী। জিনিস কিনেছি, জিনিস বেচিনি। এমন কত জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। সমস্ত জীবনটাই তাই। এখন ভাবি কিছু কিছু কাউকে বিলিয়ে দিলেও হোত। কেন, প্রেস করার সত্যিই কি ইচ্ছা আছে তোমার ?'

নীলকমল ঘাড় নেড়েছিল, তা আছে। শ্বশুর বাড়ির সম্পর্কে গুরুজন সোমনাথবাবু। বেচাকেনার প্রশ্ন তাঁর সঙ্গে ওঠে না। প্রণামী বাবদ কত দিলে চলতে পারে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিল নীলকমল।

সোমনাথবাবু বলেছিলেন, 'প্রণামী মানে তো একজোড়া খদ্দরের ধুতী। তার বেশি মণিমা'র কাছ থেকে আমি কি কিছু নিতে পারি।'

নীলকমল বলেছিল, 'কিন্তু মণিমা'র কাছ থেকে তো নয়, আপনি নেবেন আমার কাছ থেকে।'

সোমনাথবাবু বলেছিলেন, 'তোমার কাছে দশ হাজারের এক পয়সা কমেও ছাড়বনা।'

জিনিস পত্র যা আছে নতুন কিনতে গেলে হাজার সাতেক টাকার কম হবে না। কিন্তু ভাব ভঙ্গিতে বোঝা গেল, হাজার পাঁচেকেই সোমনাথবাবু ছাড়তে পারেন জিনিসগুলি। সবই যে একসঙ্গে দিতে হবে তার কোন মানে নেই। দু' তিন কিস্তিতে দিলেই চলবে। অবশ্য আরো হাজার পাঁচেক টাকা

খাটাতে হবে সেই সঙ্গে। কিন্তু এত বন্ধুবান্ধব রয়েছে, কিছু কিছু ধার কি কারো কারো কাছে মিলবে না?

প্রেসের মোহ নীলকমলের কেবল আজকের নয়, প্রায় স্কুলের আমল থেকে। হাতে লেখা ম্যাগাজিন বের করেছিল একবার। টাকার অভাবে ছাপা হয়নি। নীলকমল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, 'নিজেদের যদি প্রেস থাকত।'

তারপর কলেজী আমলেও বহু কবিতা নানা সাময়িক পত্রিকা থেকে ফেরৎ এসেছে নীলকমলের। অনেকদিন ক্ষোভ করেছে নীলকমল, 'যত সব বাজে জিনিস ছেপে পাতা ভরবে, অথচ ভালো জিনিস চোখে দেখবে না। থাকত যদি নিজেদের একটা কাগজ।'

কাগজ অবশ্য কিছু দিন একবার ক'রেছিল নীলকমলরা। কিন্তু মাস পাঁচ ছয়েকের বেশি টেঁকেনি। প্রেসের দেনা সেদিন পর্যন্তও সাত টাকা দশ আনা বাকি ছিল। নীলকমল নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছে, 'যদি নিজেদের একটা প্রেস থাকত।'

এসব কথা ঊর্মিলার অজানা নেই। একটু চুপ ক'রে থেকে ঊর্মিলা বলল, 'বেশ তো দাদা, সুবিধা মত পাওয়া গেলে জিনিসটা নিয়েই নাও না।'

নীলকমল বলল, 'নিতে যে একেবারে না পারি তা নয়। কিন্তু তোর —'

ঊর্মিলা হাসল, 'আমার জন্যই তো। নিজেদের প্রেসে

বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি সব চেয়ে ভালো ক'রে ছাপতে পারব দাদা।'

নীলকমল বলল, 'কথাটা মিথ্যা বলিসনি উমি। প্রেসের ব্যবসা এই যুদ্ধের বাজারে খুব ভালো চলছে। হয়তো বছর খানেক বছর দুই মাত্র লাগবে।'

উর্মিলা বলল, 'তা লাগুক, প্রেস কিন্তু করতেই হবে দাদা।'

সারদাবাবু বললেন, 'তোদের কি মাথা খারাপ? টাকা নেই, কড়ি নেই, ব্যবসা! শেষে কি সর্বস্বান্ত হবি?'

নিভাননী বললেন, 'উমুর বিয়ে তা'হলে কোন দিনই দিবি না তোরা? এই মতলব তোদের?'

নীলকমল বলল, 'মতলবটা তোমার কাছে খুলেই বলি মা। উমুর বিয়ে দেওয়ার গরজ আমার সব চেয়ে বেশি। কিন্তু এমন নমো নমো ক'রে দেওয়ার ইচ্ছা নেই। এতদিনই গেছে আর দুটো বছর তুমি সবুর কর মা।'

মণিমালা বলল, 'তোমার দাদাকে একমাত্র তুমিই থামাতে পার ঠাকুরঝি।'

উর্মিলা হাসল, 'হ্যাঁ দাদাকে থামাই, আর তোমরা হাজার দেড়েক দুই টাকা মাত্র খরচ ক'রে যার তার হাতে আমাকে তুলে দাও। ওই টাকায় যে কালো কুচ্ছিৎ বর হবে তার চাইতে কালিমাখা প্রেস ঢের সুন্দর হবে দেখতে।'

কেউ বাধা দিয়ে আটকে রাখতে পারল না নীলকমলকে।

কয়েকটা মাস সে ভূতের মত খাটতে লাগল। কোন্ বন্ধুকে ধ'রে কি ভাবে কত টাকা ধার নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, সে সম্বন্ধে মাথা খাটাল। ব্যাঙ্কার বন্ধু স্নেহাংশুকে ধ'রে স্ত্রীর কিছু গয়না বন্ধক রেখে ব্যবস্থা করল হাজার কয়েক টাকার ওভারড্রাফটের। কোথায় কোন্ বন্ধুর ভগ্নীপতির টাইপ ফাউণ্ড্রী আছে, একটু চেষ্টা করলে বাজারের চাইতে একটু কম দরে মিলতে পারে ভালো টাইপ, কোথায় কালি, কোথায় কাগজ, সরকারী কর্মচারীর কোন্ আত্মীয়কে ধরলে লাইসেন্স মিলতে পারে সহজে, তার জন্য কেবল চড়কী বাজীর মত ঘুরতে লাগল নীলকমল। অবাক হয়ে গেলেন সারদাবাবু আর নিভাননী। ছেলের যে এত নিষ্ঠা, এত কর্মশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল ভিতরে ভিতরে, তা যেন কোন দিন তাঁরা ভাবতেও পারেন নি। হবেনা কেন? দেখতে শুনতে, বলতে কইতে তো কারো চেয়ে ফেলনা নয় নীলকমল! এতদিন কিছু করেনি বলেই হয়নি, কেবল ঘুমিয়েছে, আড্ডা দিয়েছে, নভেল পড়েছে, পদ্য মিলিয়েছে। আর কিছু করবে কি ক'রে? এবার নতুন নেশার নতুন রসের সন্ধান পেয়েছে নীলকমল, মনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছে মনের মত কাজের মধ্যে।

রোদের মধ্যে ছুটোছুটি ক'রে হয়রান হয়ে আসে নীলকমল, ঊর্মিলা আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দেয় কপালের, মণিমালা পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস করে।

ঊর্মিলা বলে, 'দাদা এতদিন অকেজো ছিল, বিয়ে করার পর হঠাৎ কাজের মানুষ হয়ে উঠেছে। দাদার সমস্ত inspirationএর তুমিই মূল বউদি।'

মণিমালা ঘাড় নাড়ে, 'কথাটা একেবারে মিথ্যা কিনা তাই অমন শুনিয়ে শুনিয়ে সব বলতে পারছ। মূল যে কে তা সবাই জানে। কেন, আমি কি দেখতে শিকড় বাকড়ের মত? আমি বড়জোর পাতা, বড়জোর ফুল, মূল হচ্ছ তুমি।'

প্রেসের জন্য আলাদা বাড়ি নেওয়া হয় নি। বাড়ি দুর্লভ। তা ছাড়া অত ভাড়া যোগাবে কে? নিচের তলায় ছোট ছোট গোটা তিনেক কুঠরীর মত আছে। একটায় নীলকমলের বন্ধুদের আড্ডাখানা, আর একটাতে খুড়তুতো দুটি ভাই নীরু, হীরু পড়াশুনো করে, আর একখানায় রাজ্যের জঞ্জাল জড়ো হয়ে রয়েছে। এক সময় গান বাজনার সখ ছিল সারদাবাবুর, সেই ছাউনিহীন বাঁয়া তবলার খোল, একটা ভাঙা ইজি চেয়ার, মাছ ধরবার ছিপ, ভাঙা একটা রঙীন কাঁচের লণ্ঠন—কেন যে ফেলে দেওয়া হয়নি তা কেউ জানে না।

এই তিনটে কুঠরীই এবার কাজে লাগবে। ছক কেটে কেটে তৈরী হোল নক্সা। বৈঠকখানায় অফিস বসবে, আর দুটো ঘরে মেসিন আর টাইপ কেস। সিঁড়ির নিচে যে ছোট জায়গাটুকু আছে সেখানেও একটা বাল্‌ব ফিট ক'রে দিলে এক-জন কম্পোজিটার দিব্যি কম্পোজ করতে পারবে বসে বসে।

নীলকমল আর উর্মিলা দুজনে মিলে ঘরগুলি সাফ করতে সুরু করল।

নিভাননী একবার বললেন, 'বাঁয়া তবলা জোড়া একেবারে ফেলে দিসনে যেন, ওঁর সখের জিনিস ছিল তখনকার।'

আর একবার এসে দাঁড়ালেন দোরের সামনে, 'ও নীলু, ও উর্মি, তোরা কি হাত পা কেটে মরবি নাকি! আমাকে বললেই পারতিস, আমি দিতুম সাফ ক'রে। ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো পায়ে টায়ে বিঁধে বসুক তারপর ঘটাও আর এক কাণ্ড।'

নীলকমল বলল, 'বিঁধুক মা বিঁধুক। তাতে কিছু হবে না। অমন অস্থির হয়োনা তুমি।'

নিভাননী বললেন, 'না, অস্থির হব কিসের! কাঁচের টুকরোর যে কি জ্বালা তা যেন আমার জানতে বাকি আছে। ওই এক টুকরো কাঁচে উনি তিনমাস শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন সেবার।'

রিক্সায়, লরীতে, মালপত্র এসে হাজির হ'তে লাগল। বোঝাই হোল তিন ঘর। গম গম করতে লাগল বাড়ি। উদ্যোগ পর্বের উল্লাস উত্তেজনা মাসকয়েক আগের বিয়ে বাড়িকেও হার মানাল।

এবার নাম। কি নাম হবে প্রেসের?

নীলকমল বলল, 'প্রেসের নামের আগে তোর নামটাই বসিয়ে দিই উর্মি! বেশ লাগবে শুনতে।'

উর্মিলা ঠোঁট টিপে হাসল, 'কার নামটা যে মনে মনে বসাবার ইচ্ছা তা আমার জানা আছে। মণিমালা প্রেস, দুবছর বাদে এণ্ড পাবলিকেশন। কানে কি খুব খারাপ শোনাচ্ছে দাদা?'

মণিমালা বলল, 'অত ঠাট্টা কেন? আমার নামটা না হয় সকেলেঁহ।'

নামকরণ নিয়ে প্রথম প্রথম অবশ্য ঠাট্টাই চলল। কিন্তু সপ্তাহখানেক ধ'রে গুরুতর ধরণের বৈঠক বসিয়েও পছন্দসই নাম বের করা গেল না। নীলকমলের প্রস্তাব নাকচ করে উর্মিলা, উর্মিলার প্রস্তাব নাকচ করে মণিমালা, মণিমালার প্রস্তাব নীলকমল আর উর্মিলা দুজনে মিলে বাতিল ক'রে দেয়। ইংরেজী, বাংলা, কোন শব্দই পছন্দ হয় না কারো। ভালো ভালো শব্দ সংগ্রহ করার জন্য র‍্যাক থেকে নামানো হোল চলন্তিকা, নামানো হোল অক্সফোর্ড ডিকসনারী, বের করা হোল রবীন্দ্রনাথের খান পঁচিশ ত্রিশ কবিতার বই। কিন্তু কোন একটি শব্দের সুখশ্রাব্যতা সম্বন্ধে তিন জন একমত হতে পারল না। দেবদেবী, নদীপর্বত, দেশনেতা কোন নামই, কারো নামই ঠিক যেন ষোল আনা পছন্দ হয় না। একজনের পছন্দ হয় তো দুজন খুঁৎ খুঁৎ করে। দুজনের মত মেলে তো আর একজনের খুঁৎখুতি যায় না। আর সেই খুঁৎখুঁতি শেষ পর্যন্ত আরো দুজনের মনের মধ্যে সংক্রামিত হয়।

হাল ছেড়ে দিয়ে নীলকমল বলল, 'অত কথায় কাজ নেই। মায়ের নামেই রাখব প্রেসের নাম। নিভাননী প্রেস। বাস। আর কোন কথা আমি শুনতে চাই না।'

দু' কানে দুই আঙুল দিল নীলকমল, 'কোন আপত্তি শুনব না। ভালো হোক, মন্দ হোক this is settled.'

কিন্তু আপত্তি করলেন নিভাননী নিজে। তাঁর নামে প্রেসের নাম হতে যাচ্ছে শুনে ছেলে মেয়ে দুজনকে তিনি ডেকে বললেন, 'ছি ছি ছি, তোদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? আমার নাম নিয়ে তোরা হৈ চৈ করছিস আর একজনের কথা মনে পড়ল না বুঝি তোদের? বাড়ির কারো নাম যদি দিসই ওঁর নাম দিবি।'

বাবা সম্বন্ধে মার বিরূপতার কথাই জানত নীলকমল আর উর্মিলা। সব সময় দু'জনের মধ্যে খিটিমিটি লেগে আছে। এক সময়ও ভালো মুখে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন না নিভাননী। লাঞ্ছনা গঞ্জনা লেগেই আছে মুখে। সারদাবাবু বেশি কথা বলেন না। কিন্তু দু' একটি যা টিপ্পনী কাটেন তা মর্মভেদী। স্বামী স্ত্রীতে প্রায়ই বনিবনাও হয় না। বড় বড় ছেলে মেয়েদের সামনে নিভাননী গালাগাল দেন স্বামীকে, কোন রাত্রে ঝগড়া করে স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়ের কাছে এসে শোন। কিন্তু প্রেসের নাম রাখবার বেলায় নিজের নামের বদলে স্বামীর নাম রাখবারই উপদেশ দিলেন তিনি। কেবল উপদেশ নয়,

অনুরোধও, 'ওঁর নামই রাখ, সেই ভালো হবে। রঞ্জন বাদ দিলে ওনামের মানে তো সরস্বতী, তাই না?'

উর্মিলা হেসে বলল, 'ঈস নামের মানেটা পর্যন্ত মুখস্ত ক'রে রেখেছ দেখি। মানেও জান।'

নিভাননীও হাসলেন, 'জানবনা কেন। শুনেছি এন্‌ট্রান্‌স্‌ পর্যন্ত ভালো ছেলেই ছিলেন ক্লাসে। ফার্ষ্ট না হলেও সেকেণ্ড থার্ড হতেন নাকি প্রায়ই।'

নীলকমল বলল, 'মানে প্রায় সরস্বতীর বরপুত্র। একেবারে বড় না হলেও মেজো সেজো।'

সারদাবাবুর অনুমতি নেওয়ার কেউ অপেক্ষা করলনা, তবু কথাটা কানে গেল তাঁর। ছেলে মেয়েকে ডেকে বললেন, 'ব্যাপার কি? মরবার আগেই চিতায় মঠ দিচ্ছিস বুঝি?'

উর্মিলা মুখ ভার করে বলল, 'কি যে বল বাবা।'

নীলকমল কোন জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে এল মার কাছে, বলল, 'গালাগাল ধমকানিটা কিন্তু মুখের মা, ভিতরে ভিতরে কিন্তু বেশ ইচ্ছে।'

নিভাননী মৃদু হেসে বললেন, 'আঃ থাম বাপু।'

নীলকমল বলল, 'থামব কি। আফিসের খাতায় সংক্ষেপে এস, চ্যাটার্জী সই ছাড়া তো নাম গন্ধ নেই কোথাও। আর রীতিমত সাইনবোর্ডে, ছাপার অক্ষরে, প্যাডে, হ্যাণ্ডবিলে সব

জায়গায়, দিনে অন্তুতঃ পাঁচ সাত শ' বার মুখ থেকে মুখে ফিরবে নামটা। তা সহ্য হবে কেন ?'

ঊর্মিলা হেসে বলল, 'সত্যি দাদা, তোমার মত এমন কৃতী পুত্র আর হয় না। এর চেয়ে বাপের নাম আর লোকে কি ক'রে রাখে !'

নিভাননীও একটু হাসলেন, বললেন, 'উনি আমাকে কি বলছিলেন জানিস। বলছিলেন আমার নাকি খুব অসুবিধা হবে।'

নীলকমল বলল, 'কেন, অসুবিধা কিসের ?'

ঊর্মিলা দাদাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এল, 'অসুবিধা কিসের আমার কাছে শোন। কোন বুদ্ধিসুদ্ধি তো নেই। অসুবিধা লোকের সামনে প্রেসের নামটা মা মুখ ফুটে বলবেন কি ক'রে ? ভাসুর হলে না হয় বড়দা টড়দা অন্য একটা নাম বলে চালাতেন। কিন্তু এ যে বড় সাংঘাতিক নাম। উচ্চারণও করতে পারবেন না, আবার —'

নীলকমলও হাসল, 'তাই তো, তাহ'লে পাবলিসিটির একটি মুখপত্র তো আমাদের হারাতে হচ্ছে।'

সারদাবাবুর অমত সত্ত্বেও 'সারদা প্রেস'ই বহাল রয়েছে শেষ পর্যন্ত। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে ছোট ছোট দু'চারটে কাগজে। মাস মাইনের নয়, ফুরণ ক'রে জন তিনেক কম্পোজিটার নেওয়া হয়েছে। নেওয়া হয়েছে মেসিনম্যান।

চেক মুড়ির হ্যাণ্ডবিলের কিছু কিছু অর্ডার পত্র যোগাড় ক'রে দিয়েছে বন্ধুরা। কাজ সুরু হবে পয়লা আষাঢ় থেকে। পঞ্জিকা দেখে শুভক্ষণ ঠিক ক'রে দিয়েছেন সারদাবাবু। এই উপলক্ষ্যে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতে চায় নীলকমল — করুক! কিন্তু সরিৎকে কেন? সে কি বন্ধু? সে কি শত্রু হবারও উপযুক্ত? নিমন্ত্রিতদের মধ্যে তাকে দেখলে লোকে কি ভাববে, কি বলবে? মাঝে মাঝে বড় ছেলেমানুষের মত ব্যবহার করে উর্মিলার দাদা। কেন এই নাম ফের উচ্চারণ করতে গেল নীলকমল? কেন লিখতে গেল খাতায়? উর্মিলা বেশ করেছে। নিবের আঁচড়ে কেটে দিয়েছে নামটা। সেই দাগশুদ্ধ কাটা নামটা অন্ধকারে আর একবার চোখের সামনে ভেসে উঠল উর্মিলার। বুকের ভিতরে কোন একটা জায়গায় যেন টন টন ক'রে উঠল। সেখানেও বড় একটা দাগ আছে। নিবের নয়, ছুরীর।

তিন

সমবায় প্রেসের উদ্বোধন হবে ষোলই মাঘ। চৌদ্দই মাঘ সন্ধ্যার পর প্রেসের প্রায় জন পঁচিশেক অংশীদার নিমু গোস্বামী লেনে হেমন্ত ভট্টাচার্যের বাসায় এসে জমায়েৎ হয়েছিল। জন পাঁচ সাত এসে তখনো পৌঁছতে পারেনি। হয়তো ওভারটাইম খাটছে যার যার অফিসে। অংশীদারদের বেশির ভাগই কম্পোজিটার, প্রুফরীডার, মেসিনম্যানের দল। প্রেসটি গড়ে তুলবার জন্য পঞ্চাশ একশ ক'রে প্রায় সকলেই সাধ্যমত দিয়েছে। যারা এখনো দিয়ে উঠতে পারেনি, তারা পরে দেবে। বিনা মজুরীতে ফাঁকে ফাঁকে এসে গায়ে খেটে দিয়ে যাবে কেউ কেউ। দেয় টাকাটা সেই মজুরী থেকে শোধ যাবে। ষ্ট্রাইকের ফলে অন্যান্য প্রেস থেকে বিতাড়িত বেকার জন কয়েক কম্পোজিটারই আগে চাকরি পাবে এখানে। অবশ্য মাত্র চার পাঁচজনেরই ব্যবস্থা করা যাবে প্রথমে। এত চেষ্টা সত্ত্বেও খুব বেশি লোককে এখানে জড়ো করা যায় নি, সংস্থান হয়নি বেশি মূলধনের। অনেক খুঁজে পেতে, বহু ধরা পড়া, তদ্বির সুপারিশের পর মণ্ডল ষ্ট্রীটে ছোট ছোট খান তিনেক ঘর পাওয়া গেছে প্রেস খুলবার জন্য। দলপতি হেমন্ত

ভট্টাচার্যের একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছেন রেণ্ট কন্‌ট্রোলের উকিল। বিনা সেলামীতে পঁচাত্তর টাকা ভাড়ায় তিনিই জোগাড় ক'রে দিয়েছেন ঘরগুলি। মাস ছয়েকের আগাম অবশ্য দিতে হয়েছে। ঘর তো নয় ছোট ছোট খুপরি। আগে দেহ ব্যবসায়িনীরা থাকত এসব অঞ্চলে। এখন অবশ্য তারা নেই। গৃহস্থরাই এসে বাস করছে তাদের বদলে। তবু লোকের সন্দেহ যায় না, বলে কেউ কেউ এখনো আধা গৃহস্থ। রাত্রে আশে পাশে মাতালদের হৈ হল্লা এখনো চলতে থাকে। ঠিক প্রেস খুলবার মত জায়গা এটা নয়। কিন্তু অন্য কোথাও ঘর মেলেনি বলে নিরুপায় হয়েই নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ভালো জায়গায় বাড়ি নেওয়ার মত টাকাই বা কই? প্রেস যদি চলে, যদি দিন ফিরে যায়, তাহলে বাড়িও বদলানো যাবে। আপাতত একটা ট্রেড্‌ল মেসিনেই স্থুরু হবে কাজ। অনেক চড়া বাজার। প্রায় সব জিনিসই নতুন কিনতে হয়েছে। এইটুকু উদ্যোগ আয়োজনেই হাজার দশেক টাকা খরচ হয়েছে ইতিমধ্যে। এত টাকা হেমন্তর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রায় অভাবিত উপায়ে পেয়ে গেছে। বলা যেতে পারে বিয়ের পণ।

খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা সুদর্শন সরকার প্রেসটি উদ্বোধন করবেন। জন কয়েক বন্ধুও আসবেন তাঁর সঙ্গে। সবাই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করবেন। কারো কারো বক্তৃতা যে

অতিদীর্ঘ হবেনা তা অবশ্য হলফ ক'রে বলা যায় না। সুদর্শন-বাবু নিজেই একটু দীর্ঘ বক্তৃতার পক্ষপাতী।

একতলা ঘরের মেঝেয় ঢালা মাদুর বিছিয়ে কার্যকরী সমিতির অধিবেশন চলছিল। যারা কার্যকরী সমিতিতে নেই অথচ কাছাকাছি আছে তারাও এসে জড়ো হয়েছিল মাদুরের পিছনে। লোভটা কেবল প্রেস সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার জন্যই নয়। এক কাপ করে চাও মেলে এখানে, মেয়েলী হাতের মিঠে চা। বারো আনি সভ্যের সেই চায়ের লোভটাই বেশি। বেশির ভাগ সভ্যের কাছে ব্যাপারটা এখন পর্যন্ত যাত্রা থিয়েটারের মত। তবে গ্রামগঞ্জে স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত যাত্রা নয়, যেখানে পুরুষেরা মেয়ে সেজে অভিনয় করে। কলকাতার থিয়েটারই। সংখ্যায় একটি হলেও স্ত্রী ভূমিকাটি দাড়ি গোঁফ কামান ছদ্মবেশী একজন পুরুষের নয়। আসল স্ত্রীলোকেরই। তবে ঢংটা যে বেশ একটু পুরুষালী পুরুষালী তা সবাই স্বীকার করে। দলনেতা হেমন্তবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক যেন তাদের ঘরের স্ত্রীর মিল নেই। রসকসহীন আলোচনা তাদের স্ত্রীরা করে না। মাথায় আঁচলের নাম মাত্র খুঁট দিয়ে এমন অনাত্মীয় এক ঘর লোকের সামনে বেরও হয় না তারা। কিন্তু আকর্ষণ তো সেই অমিলের জন্যই।

তবু মিল যে একেবারেই না আছে তা নয়। হাতে ক'রে যখন চায়ের কাপ এগিয়ে দেয় তখন বেশ একটু মিল দেখা

যায়। শাঁখা আর কাঁকন পরা সেই হাতখানি দেখে ঘরের আর একখানি হাতের কথা মনে পড়ে। অবশ্য সকলের স্ত্রীর হাতই ঠিক এই রকম নয়। অনেকের হাতে কেবল শাঁখাই আছে সোনার চুড়ি নেই, অনেকের হাতে কেবল নোয়া, আর একগাছি ক'রে কাঁচের চুড়ি। অনেকের হাত কেবলই হাত, চায়ের বাটিওয়ালা হাত নয়। বাসন মেজে মেজে ক্ষয়ে যাওয়া লঙ্কা হলুদের ছোপ লাগা আঙুলে রাত্রে শোবার সময় অনেকের বউ কেবল একটা পান, কি পকেট থেকে আনা একটি বিড়িই, খাওয়ার পরে শোওয়ার আগে স্বামীর মুখের কাছে এগিয়ে দিতে পারে। রোজ নিজের হাতে চা ক'রে খাওয়ানোর সৌভাগ্য অনেকের স্ত্রীর কদাচিৎ হয়। চা চাও তো গলির মোড়ের দোকানে যাও! চার পয়সা ক'রে মাটির এক একটি খুরি। এত সব অমিল সত্ত্বেও নিজেদের স্ত্রীর হাতের সঙ্গে হেমন্তবাবুর স্ত্রীর হাতের মিল খুঁজে পায় দলের লোক। মিল পায় হাসিতে, মিল পায় কথায়। ভাষায় মেলে না, কিন্তু ভঙ্গিতে মেলে। দেখতে সুন্দরী না হলেও হাসিটুকু বেশ মিষ্টি, গলার স্বরটুকু ভারি নরম। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের কম নয়। কিন্তু দেহের স্বাস্থ্যে আর বাঁধুনীতে বেশ কম বলে মনে হয়।

উদ্বোধন দিবসের কার্যসূচি সম্বন্ধে যখন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল, উদ্বোধন সঙ্গীতের কোন ব্যবস্থা হবে কিনা, অধিবেশনের স্থান কি প্রেসের ঘরেই হবে, না পার্কে,

সভাপতিত্বের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের ভুবনবাবুকে যদি না পাওয়া যায়, তবে কি প্রেস কর্ম্মচারীদের সভাপতি গোলক বাবুকেই বলা হবে, এই সব নিয়ে বিতর্ক চলছিল, পিছন থেকে মেসিনম্যান ইয়াসীন হঠাৎ বলে উঠল, 'এ কথা কয়ন, ও কথা কয়ন, খাওয়া দাওয়ার কথাডা কয়ন না দেখি কেউ। সেডা বাদ দেবেন নাকি ?'

হেমন্ত মৃদু হেসে স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'বুড়ো চাচার কথা শোন। খাওয়া ছাড়া আর কোন কথা নেই মুখে।' বাইরে থেকে যাঁরা আসবেন তাঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু নিজেদের জন্য কোন বন্দোবস্ত হয়নি। এখন পর্যন্ত আয়ের নামে দেখা নেই, গোড়াতেই খরচ বাড়িয়ে লাভ কি। এই ছিল কার্যকরী সমিতির মত।

কিন্তু ইয়াসীনের প্রস্তাবটা এবার আলোচিত হবার মর্যাদা পেল। সত্যি, যাঁরা বক্তৃতা দিতে আসবেন তাঁরাই কেবল খেয়ে যাবেন আর যারা কষ্ট ক'রে বসে বসে শুনবে তারা কোঁচার খুঁটে শুকনো মুখ মুছবার ভাণ করবে, এমন হ'তে পারেনা। শুভদিনে মিষ্টি মুখটা সবাইরই চাই।

হেমন্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে বলল, 'দেখছ তো ঊর্মিলা, সবাইর মুখ চুলবুল করছে এখানে। মিষ্টি মুখের ব্যবস্থাটা মঞ্জুরই হয়ে যাক ওই দিন।'

ঊর্মিলা ঘাড় নেড়ে বলল, 'বেশ।'

সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল সমস্ত ঘরটা। খাতা পেনসিল নিয়ে সুরেশ তক্ষুণি বসে গেল ফর্দ করতে। হেমন্তর হাতে অভ্যাগতদের নামের লিস্ট। খানিক বাদে ভঙ্গ হোল সভা। দু'চারটে নাম যদি বাদ পড়ে থাকে হেমন্ত যেন বসিয়ে নেয়।

হেমন্ত বলল, 'ভালো কথা, আত্মীয় স্বজনদের দু'একজনকে বলতে ক্ষতি কি।'

উর্মিলা বলল, 'বেশ তো, বলনা।'

হেমন্ত বলল, 'আমার আত্মীয় স্বজন তো তেমন কেউ নেই। তোমার দাদাও তো হাসপাতালে। তবে তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর বন্ধু সরিৎবাবুকে বললে হয়।'

উর্মিলা কোন কথা বলল না।

হেমন্ত আবার বলল, 'দিই ওঁকে একখানা কার্ড পাঠিয়ে। খবরটা জানানো মন্দ কি!'

উর্মিলা স্বামীর মুখের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বলল 'বেশ তো।'

হেমন্ত টানা টানা অক্ষরে লিখল, 'শ্রীযুত সরিৎ মুখোপাধ্যায়।'

তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে মাপ কর মিলু, আমি কেটে দিচ্ছি এ নাম।'

উর্মিলা মৃদু হাসল, 'থাকনা, কাটবার কি হয়েছে।'

হেমন্ত অনুতাপের সুরে বলল, 'এসব ব্যাপারে আমরা

পুরুষেরা সত্যিই ভারি ইতর, ভারি ছোট। তুমি কিছু মনে করলে না তো, সত্যি বল, কিছু মনে করোনি!'

উর্মিলা এবারো একটু হাসল, বলল, 'না। কি আবার মনে করব!' হেমন্ত বলল, 'তাহ'লে নামটা কেটে দিই, কেমন? ভুলটা সংশোধন করি?'

উর্মিলা বলল, 'অমন একটু আধটু ভুল থাকা ভালো প্রুফ রীডারের জন্য। নইলে তার তো কোন কাজই থাকে না।'

হেমন্ত বলল, 'কিন্তু নামটা?'

উর্মিলা বলল, 'থাকনা, দরকার হলে আমিও কেটে দিতে পারব।'

শোয়ার সময় স্যুইচ অফ্ করবার আগে তালিকার দিকে আর একবার চোখ পড়ল উর্মিলার। হেমন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। তালিকা আর কলমটা রয়েছে টেবিলের ওপর। নামটা কেটে দিলেই হয়। কিন্তু থাক না। ছ' বছর আগে এ নাম একবার কেটে দিয়েছিল বলে, আজও যে কাটতে হবে তার কি মানে আছে? নিবের ডগায় নাম কাটবার আর দরকার নেই; গভীর ক্ষত না রাখতে পারলেও ছুরির আঁচড় কিছু তো রেখে আসতে পেরেছে এই নামী লোকের মনে। যদি নাই রাখতে পেরে থাকে তাতেও ক্ষোভ নেই। ও সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় কই উর্মিলার?

স্যুইচ অফ্ ক'রে উর্মিলা ঘুমন্ত স্বামীর পাশে গিয়ে শুয়ে

পড়ল? আশ্চর্য এক রকমের ঘটনা একেক জনের জীবনে একবারের বেশি যখন ঘটে তখন জিনিসটা এমন অদ্ভুত হয় যে কাউকে বলা যায় না, ভয় হয়, পাছে বানিয়ে বলা গল্প বলে মনে করল কেউ। কিন্তু গল্পই বুঝি কেবল বানানো হয়, জীবন বুঝি আর বানানো হয় না? নিজের হাতে আর পাঁচজনের হাতে হাতে সেই বানানো জীবন বানানো গল্পের চেয়ে বুঝি কম অদ্ভুত?

কিন্তু ঠিক এক রকম ঘটনাই কি বলা যায়? দু' বছর আগের সেই সারদা প্রেসের উদ্বোধনের নিমন্ত্রণের তালিকা আর এই তালিকা কি এক? অনেক তফাৎ। একটি নামে কেবল মিল আছে — সরিৎ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এ মিল কেবল অক্ষরের মিল, মানের মিল নেই।

চার

তালিকা থেকে সরিতের নামটা আজ কাটা না কাটা সমান কথা। কার্ড পাঠালেও সরিৎ কি আসবে? না, আসবার তার সাহস হবে? ছ'বছর আগেই হয় নি, আজ তো আরো হবে না। সেদিন উর্মিলা নামটা কেটে দিলেও নীলকমল সে কাটাকুটি মেনে নেয় নি। চিঠি পাঠিয়েছিল সরিতের নামে। বলেছিল, 'দেখা যাক, কতখানি বুকের পাটা। আসুক না একবার। শুধু এসে আমাদের আরো দশজন স্বজন বন্ধুর পাশাপাশি বসুক। শুধু একবার চোখাচোখি হোক। দেখব কতখানি সাহস ওর।'

সাহস সেদিন হয়নি সরিতের। কিংবা সারদা প্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করেনি সে।

অন্যান্য বন্ধুরা চা জলযোগে আপ্যায়িত হয়ে, শুভেচ্ছা জানিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর নীলকমল বলেছিল, 'দেখলি তো, viallain নয়, ভীরু! চিঠি পেয়ে কি করে তাই দেখবার জন্যই ওকে চিঠি দিয়েছিলাম। সরিতের ধারণা আমার দ্বারা কোনদিন কিছু হবে না। হোল কি না হোল, দুজনে মিলে

আমরা কিছু গড়ে তুলতে পেরেছি কিনা একবার এলেই দেখতে পারত।'

উর্মিলা মনে মনে হেসেছিল। বন্ধুকে নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্যটা নীলকমলের যে তাই, নিজের কৃতিত্ব দেখান, সেটা বুঝতে বাকী ছিল না উর্মিলার। যত অন্যায়, যত অপরাধই করে থাকুক সরিৎ, নীলকমল যে একটা কিছু করবার মত করেছে তা এসে প্রত্যক্ষ ক'রে যাক। অন্য পাঁচজন বন্ধুর মত মন খুলে প্রশংসা না করতে পারুক, তারিফ করুক মনে মনে। সরিতের বাবা বেঁচে থাকতে ম্যাগাজিন ছাপবার চেষ্টা সরিৎও করেছে, কিন্তু পেরে ওঠেনি। সেদিক থেকে ভারি শক্ত লোক ছিলেন জনার্দন মুখুয্যে। ছেলের খামখেয়ালিকে মোটেই প্রশ্রয় দেন নি। সরিতের চেয়ে অনেক গরীব হয়েও তার আগে যে নিজে প্রেস করতে পেরেছে নীলকমল এ কি কম গৌরবের কথা? আর সে গৌরব কি সম্পূর্ণ হয় যদি সরিৎ নিজের চোখে এসে না দেখে?

দাদার মনের ভাব বুঝে উর্মিলা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'দেখবার মত জিনিস আগে গড়ে তোল দাদা, তারপর তা দেখবার লোকের অভাব হবে না। সারা সহরের লোক নিমন্ত্রণ ক'রে এনে দেখাব।'

নীলকমল বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, করতে পারি কি না পারি দেখ চেয়ে চেয়ে।'

কিন্তু কেবল চেয়ে চেয়ে দেখে হবে কি, দিন কয়েকের মধ্যেই হাতে কলমে কাজে লেগে গেল ঊর্মিলা। কলমের কাজ নীলকমলই করে। চিঠিপত্র লেখে, প্রিণ্ট অর্ডার দেয়। ঊর্মিলা শিখতে লাগল হাতের কাজ। সুরু করল কম্পোজিটারী থেকে। হরিবাবু নামে নিকেলের চশমা চোখে মাঝবয়সী একজন কম্পোজিটারকে নেওয়া হয়েছিল বিশেষজ্ঞ হিসাবে। তিনিই সব দেখাশোনা করতেন। ঊর্মিলা তাঁকে গিয়ে ধরল, 'হরিবাবু, আমাকে কাজ শিখিয়ে দিতে হবে।'

হরিবাবু কপালে চোখ তুললেন, কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন ঊর্মিলার দিকে, তারপর বললেন, 'সে কি মা, আপনি এসব শিখে কি করবেন ?'

'কেন কাজ করব। সাহায্য করব আপনাদের।'

কি বুঝলেন হরিবাবু তিনিই জানেন। দীর্ঘনিশ্বাস চাপলেন যেন একটু, তারপর সহানুভূতির সুরে বললেন, 'বেশ তো মা, শিখতে চান শিখবেন। কোন কাজই তো খারাপ নয়, এ-ও বিদ্যা। বিদ্যা যত জানা যায় ততই ভালো। বড়বাবু ছোটবাবু যদি আপত্তি না করেন —'

ঊর্মিলা বলল, 'না, ওঁরা কোন আপত্তি করবেন না।'

কিন্তু সব চেয়ে আগে, সব চেয়ে জোরাল আপত্তি করলেন নিভাননী। মেয়েকে ধমকে দিয়ে বললেন, 'ফের তুই নিচে নামতে সুরু করেছিস ? প্রেসে তোর কি কাজ ?'

ঊর্মিলা বলল, ‘প্রেসেই তো আমি কাজ শিখছি মা।’

নিভাননী অবাক হয়ে বললেন, ‘কাজ শিখছিস! কি কাজ শিখছিস তুই অতগুলি ব্যাটাছেলের মধ্যে, জানা নেই, শোনা নেই —’

ঊর্মিলা বলল, ‘সেই তো ভালো মা। ওরা কেউ দাদার জানাশোনা বন্ধু নয়। আর ব্যাটাছেলে হলে কি হবে সব ওরা আমাদের কর্মচারী। চাকর বাকরের মত। ব্যাটা ছেলে তো ধোপাও, ব্যাটা ছেলে তো মেথরও, তাতে কি হয়?’

নিভাননী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে, শাসনের সুরে বললেন, ‘উমি! কালে কালে তোরা হলি কি, বল দেখি। লঘু গুরু জ্ঞান নেই? গ্রাহ্য নেই মা বাপ বলে?’

ছেলে বেলার মত মার কোলের কাছে এগিয়ে এল ঊর্মিলা, কাঁধের সঙ্গে মুখ মিশিয়ে বলল, ‘আমাকে মাপ কর মা, কিন্তু কাজ শিখতে মানা কোরো না। খালি খালি কি ভালো লাগে?’

নিভাননী মেয়ের পিঠে নিঃশব্দে হাত বুলাতে লাগলেন, হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারলেন না। ঊর্মিলা বলল, ‘আমাকে হুকুম দাও মা। আগের মত বৈঠকখানায় তো যাচ্ছি না, প্রেসে যাচ্ছি। তোমার কোন ভয় নেই। আর কোন ভুল হবে না আমার, আর কোন দোষ করব না।’

নিভাননী আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, 'দোষ তো তোর নয় উর্মি, দোষ আমার নিজের। দোষ আমার কপালের। সে দোষ শোধরাতে নীলু আজ পর্যন্ত দিল না আমাকে। দেখি আর একবার ওকে বলে। এমন হাত পা ছেড়ে বসে থাকলে কি কোন কালে কিছু হবে?' আগড়পাড়ায় নাকি ভালো একটি ছেলে আছে, নতুন ক'রে ছেলের খোঁজ সুরু করলেন নিভাননী। আর উর্মিলা হরিবাবুর কাছে টাইপ চিনতে আরম্ভ করল, শিখতে লাগল প্রুফ দেখা।

সিঁড়ির নিচে সেই ছোট খোপটুকুর মধ্যে টুল পেতে উর্মিলা বসল ডান ধারে বাঁ ধারে সামনে টাইপ কেস নিয়ে। তারপর মাস দুই পরেই নীলকমলকে গিয়ে বলল, 'দাদা, মাইনে ঠিক ক'রে দাও আমার। হরিবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ একজন পুরো কম্পোজিটারের কাজ তোমার চালিয়ে দিচ্ছি কিনা।'

নীলকমল হেসে বলল, 'মাইনে নিবি না ম্যানেজারী নিবি, দেখ চিন্তা করে।'

মণিমালা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁদুরের ফোঁটা সুগোল ক'রে তুলছিল গৌরবর্ণ কপালে, মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আহাহা, ম্যানেজারীর যেন কিছু বাকি আছে। কেবল ম্যানেজারী কেন, গোটা প্রেসটাই তো একরকম দখল ক'রে বসেছ তুমি।'

কথাটা মিথ্যা বলেনি মণিমালা। সে কেবল নীলকমলের

গৃহিণী, কেবল অবকাশরঞ্জিনী। কিন্তু স্বামীর সব কাজের কথা উর্মিলার সঙ্গে। প্রেসের সব খুঁটিনাটি ব্যাপার, দৈনন্দিন কাজ কর্মের সুবিধা অসুবিধা আর ভবিষ্যতের জল্পনা কল্পনা নিয়ে রাত সাড়ে এগারটা বারটা পর্যন্ত প্রায় রোজ দুই ভাইবোনে আলাপ আলোচনা চলে। মণিমালা কিছুক্ষণ বসে বসে শোনে কিন্তু কোন কথা বলবার ফাঁক পায় না। তারপর এক সময় উঠে পড়ে।

উর্মিলা বলে, 'চললে নাকি বউদি ?'

মণিমালা বলে, 'চলব না কি করব! আমাকে বাদ দিয়েই তো তোমাদের প্রেস।'

প্রেসের কাজকর্ম সম্বন্ধে উর্মিলার সঙ্গে সঙ্গে মণিমালাও একদিন কৌতূহল প্রকাশ করেছিল। কিন্তু নিভাননী মোটেই উৎসাহ দেননি, নিষেধই করেছেন। বলেছেন, 'না মা। উমি যাচ্ছে যাক। তুমি বউ মানুষ, ও সবের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই, লোকে নিন্দা করবে। তা ছাড়া সবাই প্রেস নিয়ে মাতলে ঘর গৃহস্থালী দেখবে কে ?'

উর্মিলাও নিজস্ব ভঙ্গিতে মার কথায় সায় দেয়, 'সত্যি বউদি। দরকার কি তোমার প্রেস ঘরে গিয়ে ? কালিঝুলি লাগবে।'

মণিমালা বলে, 'তোমার বুঝি লাগবার ভয় নেই ?'

উর্মিলা মাথা নাড়ে, 'না বউদি, নেই। আমার গায়ের রঙ

আর প্রেসের কালির রঙ এক কিনা, লাগলে বোঝা যাবে না। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। অমন কাঁচা সোনার বর্ণে দু' এক ফোঁটা কালি যদি লেগে বসে, বাজার থেকে সাবান কিনতে কিনতে প্রেস নিলামে উঠবে দাদার।'

মণিমালা বলে, 'দরকার নেই ভাই তোমাদের প্রেস নিলামে তুলে। আমার তেল সাবান আলতা মাথায় থাকুক, তোমাদের প্রেস তোমাদের থাকলেই বাঁচি।'

যুদ্ধের বাজারে কাজ যে ভাবে এগুতে লাগল তাতে মণিমালার তেল সাবান আলতার সরবরাহে কোন ত্রুটি ঘটল না। দাখিলা, চেক, হ্যাণ্ডবিল, প্যাম্ফলেটের অর্ডার ভালোই আসতে লাগল। গোটা কয়েক অফিস, ফার্ম, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাজ জোগাড় ক'রে দিল বন্ধুর দল। বাঁধা খদ্দের হয়ে রইল তারা। তিনজন কম্পোজিটার ফুরনে কাজ করত, তাদের মাস মাইনেয় বেঁধে রাখা হোল। অফিসের দুশো টাকা বাঁধা মাইনের চাকরি ছেড়ে চেয়ার টেবিল, টাইপরাইটার, ফোনে ফ্যানে ভালো ক'রে অফিস সাজিয়ে বসল নীলকমল।

সারদাবাবুর শরীর ভালো না। গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগছেন অনেকদিন ধ'রে। ছেলেকে ওপরের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'ফের যে চাকরি ছাড়লি, খাবি কি? প্রেসের কাগজ কালি খেয়ে কি পেট ভরবে?'

চিরদিন চাকরি করে এসেছেন সারদাবাবু। চাকরি ছাড়লে

যে অন্নজল ছাড়তে হয় সে সম্বন্ধে তাঁর কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু নীলকমল বাপকে ভরসা দিয়ে বলল, 'আপনার ভয় নেই বাবা। কি খেয়ে পেট ভরে, কি খেয়ে পেট ভরে না তা আমার জানবার বয়স হয়েছে। ফলটল যা আপনার খেতে ইচ্ছা করে বলবেন, আনিয়ে দেব।'

সারদাবাবু মাথা নাড়লেন, 'কিছু না, কিছু না। তোমার হাতের কোন ফলে কাজ নেই আমার। যদি দিতেই হয়, একেবারে বিষফলই দিয়ো।'

কথাবার্তার সময় ঊর্মিলা বসে ছিল বাবার ঘরে। বাইরে এসে নীলকমলকে ধমক দিয়ে বলল, 'ছিঃ বাবার সঙ্গে অমন ক'রে কথা বল কেন দাদা। এক ফোঁটা মায়া মমতাও কি নেই তোমার মনে?'

ছেলের ওপর সারদাবাবুর অভিমানও কম ছিল না। সেই অভিমান থেকেই এই সব রূঢ় কথা বেরিয়ে আসত। নীলকমল কেবল প্রেসের নামের সঙ্গে বাবার নাম জড়িয়ে রেখেছিল, আর কিছুতে জড়াতে দেয় নি। ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করেছে, ঊর্মিলার সঙ্গে আলোচনা করেছে, তবু জিজ্ঞেস করেনি সারদাবাবুর মতামত। ঊর্মিলা কিছু বললে জবাব দিয়েছে, 'দেখ, ও সব লোক-দেখান ভদ্রতা আমার আসে না। সারাজীবন চাকরি ছাড়া কিছু করলেন না, ব্যবসার উনি কি বোঝেন যে বলবেন?'

ঊর্মিলা প্রতিবাদ করেছে, 'কিছু না বুঝলেও তোমার চেয়ে ঢের বেশি বোঝেন। অন্তত বয়সের একটা অভিজ্ঞতা তো আছে।'

নীলকমল জবাব দিয়েছে, 'না, নেই। বয়সের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই অভিজ্ঞতার। চোখ কাণ বুজে থাকলেও মানুষের বয়স বাড়ে, চুল দাড়ি পাকে। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিও যে পাকবে তা তোকে কে বলল ?'

ঊর্মিলাও টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না, 'কে আবার বলবে। রাজ্যশুদ্ধ লোক কেবল তোমার বুদ্ধির কথাই বলাবলি করে দাদা।'

বাবার জন্য ভারি দুঃখ হয় ঊর্মিলার। লজ্জা হয় নীলকমলের ব্যবহারের জন্য। কেন ওঁর মুখের ওপর অমন রূঢ় কথা বলে নীলকমল ? কেন অমন ক'রে ওঁকে আঘাত দেয় ? অথচ ঊর্মিলার ওপর তো নীলকমলের মমতা কম নেই ? বাবার ওপরই বা এমন নির্মম কেন ?

প্রেসের কাজ কর্মের ফাঁকে সারদা বাবুর কাছে গিয়ে বসে ঊর্মিলা। চুলের ভিতর দিয়ে আঙ্গুল বুলোয়। খোঁজ খবর দেয় প্রেসের, দাদার দোষ ঢাকতে চেষ্টা করে। বাবার সঙ্গে কথা বলে বলে ঊর্মিলা এটুকু বুঝে নিয়েছে, মুখে যত রাগা-রাগিই করুন, যত কঠোরতাই দেখান, ভিতরে ভিতরে ছেলের ওপর মমতাও তাঁর কম নেই। নীলকমলও হয়তো সে কথা

জানে। তাই এত বিরোধিতার সাহস পায়। ছেলের বিরুদ্ধে নিজে অনেক কথা বললেও অন্য কারো মুখ থেকে সে সব কথার প্রতিবাদ শুনতেই ভালোবাসেন সারদাবাবু, ভালো-বাসেন ছেলের প্রশংসার কথা শুনতে।

বাবার পাকাচুল তুলতে তুলতে ঊর্মিলা সেদিন সেই কথাই শোনাচ্ছিল, 'সত্যি, দাদা যে এমন কাজের লোক হয়ে উঠবে, তা আমরা ভাবতেই পারিনি বাবা। সকলেই ভেবেছিল অন্যান্য অফিসে যেমন করেছে, গোড়ায় ক'দিন একটু হৈ চৈ ক'রেই দাদা আবার পিছিয়ে আসবে। কিন্তু তা নয়, ঠিক আগের মতই সমানে চালিয়ে যাচ্ছে।'

সারদাবাবু বললেম, 'হুঁ, এ বলে ওকে দেখ ও বলে একে দেখ। তোরা তো একজনের ঢাক আর একজনে বাজাবার তালেই আছিস। বুঝলুম তো সবই, কিন্তু তোর কি গতি হবে? তুই কি এই ভাবেই থাকবি নাকি চিরকাল?'

ঊর্মিলা চুপ ক'রে রইল। কিছুদিন বাদে বাদে এ প্রশ্নটা বাড়ির কারো না কারো মনে হঠাৎ জেগে ওঠে, কিন্তু প্রশ্নের সেই তীব্রতাটা যেন অনেকখানি মন্দীভূত হয়ে গেছে। নতুন কোন জবাব যেন আর দেওয়ার নেই। সবাই জানে এভাবে চলতে পারে না। ঊর্মিলার ওপর ঠিক যেন সুবিচার হচ্ছে না। অথচ সুবিচারের জন্য উঠে পড়ে লাগবার উদ্যমটা যেন

কারো ভিতরেই আর নেই। চেষ্টা ক'রে তো যথেষ্ট দেখা গেল, এবার দেখা যাক বিনা চেষ্টায় কি হয়।

নিভাননী বলেন, 'জন্ম মৃত্যু বিয়ে, বিধাতাকে নিয়ে, মানুষের হাতে কিছু নেই।'

উর্মিলার বিয়ের কথাটা যখনই নীলকমলকে কেউ মনে করিয়ে দেয়, কিংবা কোন কোন মুহূর্তে নিজেরই মনে পড়ে যায় তার, নীলকমল তাকে আরো বেশি ক'রে প্রেসের কাজের মধ্যে টানে, কর্তৃত্বের অংশ দেয়।

উর্মিলা মাঝে মাঝে হাসে, 'ক্ষতিপূরণ করছ বুঝি দাদা।'

নীলকমল বলে, 'তা একটু একটু করতে চেষ্টা করছি বই কি। তোকে জোর ক'রে কারো ঘাড়ে তো আর ফেলে দিতে পারিনে।'

উর্মিলা বলে, 'তাই প্রেসটাই বুঝি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ।'

প্রেসের ব্যাপারে উর্মিলা যে ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, তা উর্মিলা নিজেও জানে, বাড়ির অন্যান্য সবাইও টের পেয়েছে। কেবল কম্পোজ করা নয়, প্রুফ, প্রিন্ট-অর্ডার, মেক-আপ, লে-আউট সম্বন্ধে মোটামুটি বেশ একটা জ্ঞান হয়েছে উর্মিলার। বরং এসব ব্যাপারে তার পরামর্শ, তার রুচিই বাইরের খদ্দেরদের পছন্দ হয় বেশি। সরকারী এবং অন্যান্য অফিসে যে সব চিঠি পত্র লিখতে হয় তার খসড়া

নীলকমলই করে, টাইপ করে উর্মিলা। ডাক খোলে, ডাক পাঠায়। একটু একটু ক'রে নীলকমলের কাজ তার হাতে এসেই পৌঁছতে থাকে।

নীলকমল একেকদিন বলে, 'আমাকে যে এমন ভাবে খোঁড়া ক'রে তুললি, শেষে উপায় হবে কি? তোকে ছাড়া যে এক পাও চলতে পারব না। তোকে ছাড়া যে প্রেস চলবে না। তুই গেলে —'

উর্মিলা বলে, 'আমি যেন যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছি। এক পাও আমি নড়ছিনা এখান থেকে, তোমরা তাড়িয়ে দিলেও না।'

তাড়িয়ে দিতে যে চায় না নীলকমল, ধ'রে রাখতেই চায়, সে কথা তার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে বাকি থাকে না উর্মিলার। সবাই জানে প্রেসের সঙ্গে প্রায় অচ্ছেদ্যভাবে উর্মিলা জড়িয়ে গেছে। আর জড়িয়ে গেছে দেখে সবাই যেন খানিকটা নিশ্চিন্তও হয়। যেন অবলম্বনটা উর্মিলাকে বাড়ির সবাই মিলেই জুটিয়ে দিয়েছে। এ বয়সে একটা কিছুকে অবলম্বন ক'রে, গভীরভাবে মেতে থাকা বরং ভালো। তাতে চিত্ত স্থির থাকে। চঞ্চল হওয়ার মত সময় থাকে না।

প্রেসের অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশা নিয়ে প্রথমে যে একটু আপত্তি উঠেছিল, তা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেল। মেসিন-ম্যানে, কম্পোজিটারে জড়িয়ে যে পাঁচজন কর্মচারী

আছে, তার মধ্যে তিন জনই মাঝ-বয়সী, আর দুজন ছোকরা। কুড়ির নিচে বয়স। ছোট বড় সবাই উর্মিলাকে দিদিমণি বলে ডাকে। কড়া মনিবের মত মান্য করে, বেশি ভয় করে নীলকমলের চাইতে।

তবু মাঝে মাঝে বিয়ের কথা ওঠে উর্মিলার। উঠবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব দেখা যায়। কেমন একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব হয় সারদাবাবু আর নিভাননীর মুখের। উর্মিলা কথাটাকে আর এগুতে দেয় না, বলে, সেজেগুজে পাত্রপক্ষের কাছে পরীক্ষার্থিনী হয়ে দাঁড়াবার তার বয়সও নেই।

এসব কথা কানে গেলে নিভাননী আবার চটে যান, 'না বয়স নেই। কুলীন বামুনের ঘরে তোর মত মেয়ের অভাব আছে নাকি? যত সব ঢং।'

সারদাবাবুও সেই কথা তুলেছিলেন। যখনই উর্মিলা নিরালায় বাবার কাছে এসে বসে, পায়ে হাত বুলায়, কোনদিন বা শিয়রের কাছে বসে আঙুল চালায় চুলের মধ্যে, তখনই মেয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠেন তিনি।

'তোর কোন গতি বোধ হয় আর ক'রে যেতে পারলাম না।'

উর্মিলা বলল, 'কি যে বলেন বাবা। কিছুদিন থেকেই আপনার কেবল যাই যাই সুরু হয়েছে। কে যেতে দেবে আপনাকে? যাবেন কোথায়?'

সারদাবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'যেতে সবাই দেবে। কিন্তু যাব যে কোথায় তা কি ক'রে বলব।'

তের চৌদ্দ বছরের একটি ছোকরাকে রাখা হয়েছে বেয়ারা হিসাবে। নাম গন্ধর্ব। চেহারাটা অবশ্য গন্ধর্বোচিত নয়। মুখভরা বসন্তের দাগ। নাকটা চেপটা। ঠোঁটের এক জায়গায় কাটা। কিন্তু কাজকর্মে ভারি চটপটে। একতলা থেকে দোতলায় তার অবাধ গতিবিধি। প্রেসের কাজও করে, বাড়ির সকলের ফুট ফরমায়েসও খাটে।

গন্ধর্ব এসে দোরের কাছে দাঁড়াল, 'দিদিমণি।'

ঊর্মিলা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'কি বলছিস।'

'দাদাবাবু ডাকছেন আপনাকে।'

ঊর্মিলা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এইতো এলাম নিচে থেকে, বলগে আমি এখন যেতে পারব না। বাবার সঙ্গে কথা বলছি।'

কিন্তু সারদাবাবুই তুলে দিলেন মেয়েকে। বললেন, 'না বাপু, আর কোন দরকার নেই আমার কথার। তুমি যাও তোমাদের প্রেসে। দেখ গিয়ে আবার কি ফ্যাসাদ বেধেছে।'

মুখ মুচকে হাসল ঊর্মিলা। ভাবখানা — অমন নিস্পৃহ হলে কি হবে? সব দিকে লক্ষ্য আছে বাবার, মমতা আছে সব জিনিসের ওপর।

ফ্যাসাদ কিছু কিছু সুরু হয়েছিল। হেড কম্পোজিটার

হরিবাবু দিন কয়েক আগে কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রেসে চলে গেছেন। তাঁর জায়গায় উপযুক্ত লোক এখনো নেওয়া হয়নি। ফলে কাজকর্মের ভারি অসুবিধা হচ্ছে প্রেসে।

ঊর্মিলা অফিস ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, দোরের কাছে থমকে দাঁড়াল। ছাব্বিশ সাতাশ বছরের অপরিচিত একজন ভদ্রলোক নীলকমলের সামনের চেয়ারে বসে কথা বলছেন।

নীলকমল ঊর্মিলাকে ইতস্তত করতে দেখে বলল, 'ওকি, আয় এখানে। শিশিরকে বলেছিলাম লোকের কথা, সে-ই এঁকে পাঠিয়েছে। প্রেসের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার চেয়ে তোর অভিজ্ঞতাই তো বেশি। সেইজন্যই তোকে ডাকলাম, আলাপ আলোচনা ক'রে দেখ এঁর সঙ্গে। হেমন্তবাবু, এর কথাই বলছিলাম আপনাকে, আমার বোন। বলতে গেলে প্রেসের সর্বেসর্বা।'

হেমন্ত কপালে হাত তুলে নমস্কার করল। শ্যামবর্ণ, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘাকার চেহারা, মুখ ভ'রে ছোট ছোট বসন্তের দাগ না থাকলে মুখখানাকে সুন্দরই বলা চলত। কেবল বসন্তের দাগই নয়, জীবনের অনেকগুলি বছর যে কৃচ্ছ্রতার মধ্যে কেটেছে তারও চিহ্ন আছে মুখে। গায়ে আধময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবী। বেশে বাসে বিত্তহীন ঘরের ছেলে বলে বেশ বোঝা যায়।

ঊর্মিলা প্রতিনমস্কার ক'রে দাদার দিকে তাকিয়ে বলল,

'আমি আর কি আলাপ করব ? প্রেসের সব রকম কাজ জানা লোকই তো একজন দরকার আমাদের। উনি যখন এসেছেন, মনে হয় প্রেসের কাজে ওঁর অভিজ্ঞতা আছে।'

নীলকমল মৃদু হেসে বোনকে বলল, 'এই বুঝি তোর ইণ্টারভিউ নেওয়া ? ওঁর অভিজ্ঞতা আছে কি না আছে ওঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস ক'রে দেখবি। সেইজন্যই তো ডেকেছি তোকে।'

অস্থানে অসময়ে দাদার এই পরিহাসপ্রিয়তা দেখে বিরক্ত হোল ঊর্মিলা। দিন কয়েক আগে একবার অবশ্য সে বলেছিল দাদাকে, 'ইণ্টারভিউ জীবন ভরে কেবল দিলামই দাদা, নিলাম না। লোকজন যখন নাও, তখন দু'একবার আমাকে ইণ্টারভিউর চান্স দিয়ো তো।'

সেই চান্স নীলকমল এবার দিয়েছে ঊর্মিলাকে। দাদা যে সত্যি সত্যিই তাকে এমন অপ্রস্তুত আর বিব্রত করবে তা ঊর্মিলা ভাবতে পারেনি! কোন যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে দাদার! একজন বাইরের লোকের সামনে, কর্মচারী হয়ে যে আসছে তাদের প্রেসে তার সামনে এ ধরণের হালকা কথাবার্তা কি ভালো ?

ভাইবোনের ঘরোয়া রসিকতায় হেমন্ত কিন্তু যোগ দিল না, নীলকমলের দিকে চেয়ে বলল, 'তা হলে আপনাদের মতামতটা —'

নীলকমল বলল, 'বসুন', তারপর বোনের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলল, 'উর্মি, তাহলে তোমার মতামতটা —'

উর্মিলা এবার সরাসরি তাকাল হেমন্তর দিকে, বলল, 'প্রেসের কাজকর্ম জানেন শুনলুম। কতদিন আছেন এ লাইনে ?'

হেমন্তর চোখেও এবার যেন একটু বিস্ময় আর কৌতূহল ফুটে উঠল, সত্যিই তার ইন্টারভিউ নিচ্ছে নাকি মেয়েটি ?

হেমন্ত বলল, 'বছর চারেক হোল।'

উর্মিলা বলল, 'কোন্ কোন্ প্রেসে কাজ করেছেন ?'

হেমন্ত বলল, 'বরিশালের দু' তিনটে প্রেসে ছিলাম।'

উর্মিলা বলল, 'ও, মফঃস্বলে ছিলেন। তা সে সব প্রেসের চাকরি ছেড়ে এলেন কেন ?'

হেমন্ত বলল, 'নানা অসুবিধার জন্যই ছেড়ে আসতে হোল।'

উর্মিলা গম্ভীরভাবে বলল, 'এখানে আমাদের একজন অভিজ্ঞ লোকের দরকার। চার্জে থাকতে হবে প্রেসের। দরকার মত বাইরেও বেরুতে হবে। পারেন সে সব ? রাস্তাঘাট সব চেনা আছে ?'

জিজ্ঞেস করতে করতে রীতিমত আত্মপ্রসাদ বোধ করল উর্মিলা। দাদা দেখুক ইন্টারভিউ নিতে সে পারে কিনা। পাত্রপক্ষের কাছে কতবার কত রকম প্রশ্নই শুনতে হয়েছে।

কেউ চেয়েছে রবিঠাকুরের কবিতা শুনতে, কেউ বা রান্নার, কেউ ঘর গৃহস্থালীর। অসংখ্য রকম প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে উর্মিলাকে। এতদিন পরে প্রশ্ন করবার অধিকার যখন নিজের হাতে এসেছে তখন উর্মিলা তার শোধ তুলে ছাড়বে।

কিন্তু হেমন্ত সব রকম প্রশ্নের সুযোগ তাকে এই মুহূর্তে দিল না। উর্মিলার প্রশ্নের জবাবে মৃদু হেসে বলল, 'এতদিন মফঃস্বলে থাকলেও কলকাতার রাস্তাঘাট আমি মোটামুটি চিনি। তাতে কোন অসুবিধা হবে না। কাজকর্মের অভিজ্ঞতা কাজ দেখলেই তো বুঝতে পারবেন। সব কথা আমার নীলকমল বাবুর সঙ্গে হয়েছে।'

হেমন্ত নীলকমলের দিকে তাকাল, 'তাহলে —'

নীলকমল বলল, 'বলেছি তো, কাজকর্ম পছন্দ হলে আমরা টাকা পঞ্চাশেক আপাতত দিতে পারব। ইনফ্যান্ট প্রেস। এর বেশি খরচ করা এখন আর সম্ভব নয়। তারপর যদি উন্নতি হয় তখন আপনাদের সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই বিবেচনা করা হবে। খেটে খুটে চেষ্টা করে দেখুন জিনিসটাকে আগে দাঁড় করান যায় কিনা।'

হেমন্ত বলল, 'আজ্ঞে সে চেষ্টা তো করবই।'

নীলকমল বলল, 'তাহলে কাল থেকেই লেগে যান। আমাদের আরো অনেক লোক ছিল হাতে। কিন্তু শিশিরের

নাম ক'রে এসেছেন আপনি। আপনাকে নিতে পারলেই আমরা খুসি হই। শিশির আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

হেমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাল, 'তাহলে কাল থেকে —'

নীলকমল জবাব দিল, 'হ্যাঁ, কাল থেকেই লেগে যান। লোক শর্ট আছে আমাদের।'

হেমন্ত উঠে গেলে নীলকমল উর্মিলাকে বলল, 'ইণ্টারভিউ নেওয়ার সাধ ছিল, হোল তো এবার? কিন্তু ইণ্টারভিউ যারা দিতে জানে না, তারা নিতেও জানে না। প্রেসের খুঁটিনাটি ভালো ক'রে জিজ্ঞেস করলেই পারতি। অমন ঘাবড়ে গেলি কেন বল দেখি।'

উর্মিলা বলল, 'বাঃ, ঘাবড়ালাম আবার কোথায়? লোকটি বেশ একটু চটেছে বলে মনে হোল, তাই না দাদা?'

নীলকমল বলল, 'চটবেই তো। এত বিষয় থাকতে তুই কিনা জিজ্ঞাসা করলি রাস্তাঘাট চেনে কিনা। কাউকে বাঙাল মনে করলে সে চটবে না? অবশ্য হেমন্তকে কাল বলে দিতে হবে যে আমরাও বাঙাল। পুরোপুরি এক পুরুষের সহুরেও নয়।'

উর্মিলা বলল, 'তা বলতে চাও বল। রাস্তাঘাট তো দূরের কথা রান্নাবান্না জানে কিনা তাও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল আমার।'

নীলকমল বলল, 'গলায় পৈতা দেখেছিস বুঝি? বড় স্পর্ধা তো তোর।'

ঊর্মিলা বলল, 'স্পর্ধা আমার নয় দাদা, স্পর্ধা এই লোকটির। কি ভাবে আমাকে এড়িয়ে গেল দেখলে তো। টের তো পায় নি, আসল ম্যানেজারটি কে?'

নীলকমল হাসল, 'দোহাই উর্মি। বেশি টের পাইয়ে দরকার নেই। উপযুক্ত লোক পাওয়া শক্ত।'

ঊর্মিলা বলল, 'তোমার এই লোকটি কতখানি উপযুক্ত হবে তা অবশ্য বলতে পারিনে, কিন্তু শক্ত যে হবে তা বেশ বোঝা গেল। যেমন চেহারায়, তেমনি কথাবার্তায়, বেশ একটু চোয়াড়ে চোয়াড়ে ভাব, তাই না?'

নীলকমল বলল, 'কাজের লোক একটু চোয়াড়েই হয়।'

ঊর্মিলা বলল, 'তা যেমন হয়, তেমনি যারা কাজ করায় তাদের আরো চোয়াড়ে হওয়া দরকার দাদা। ম্যানেজারীটা আমারই নিতে হোল দেখছি, তোমার মত নরম মনিব পেলে সবাই সুবিধা নিতে চাইবে।'

নীলকমল হাসল, 'তুই যে রাতারাতি একেবারে ঝানু ক্যাপিটালিষ্ট হয়ে গেলি। আজকালকার দিন কাল তো দেখছিস। মুখের মিষ্টি দিয়ে কাজ করাতে হয় লোককে, কড়া কথায় কোন লাভ হয় না।'

পরদিন থেকে কাজে লেগে গেল হেমন্ত। মফঃস্বল

প্রেসের অভিজ্ঞতা হলেও যেটুকু আছে সেটুকু যে হেমন্তের পাকা অভিজ্ঞতা সে কথা সবাই স্বীকার করল। কেবল খাটতেই নয়, খাটাতেও জানে হেমন্ত। সে যতক্ষণ থাকে কোন কম্পোজিটার চুপচাপ বসে থেকে কাজে ফাঁকি দিতে পারে না। তাদের মধ্যে যথাযোগ্য কাজ ভাগ ক'রে দেয় হেমন্ত।

দুখানা মাসিক পত্রিকার এবং খান তিন চার বইয়েরও কাজ এসেছে প্রেসে। সে সব কাজে পেজের মেক-আপ, লে-আউটে আগেকার হরিবাবুর চাইতে হেমন্তর দক্ষতা এবং সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় বেশি। নীলকমল বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল, এতদিনে সত্যিই একজন যোগ্য লোক পাওয়া গেছে।

কিন্তু লোক যোগ্য হলেও ততখানি প্রসন্ন হতে পারল না উর্মিলা। হরিবাবু যখন ছিলেন, উর্মিলা যা পরামর্শ দিত তাই হোত। এমন কি অন্যান্য কম্পোজিটাররা হরিবাবুর চাইতে উর্মিলার মতামত মেনে চলত বেশি। ভুল হলেও মানত। কারণ পছন্দটা উর্মিলার পছন্দ। কিন্তু হেমন্ত আসায় অন্যরকম হতে লাগল। নীলকমলও এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভর করল হেমন্তর ওপর। নিজের রুচি, নিজের পছন্দ প্রত্যেকটি বিষয়ে খাটাতে লাগল হেমন্ত। উর্মিলার নির্দেশ আর আমল পায় না।

ঊর্মিলা একদিন অভিযোগও করল দাদার কাছে, বলল, 'যা বলেছিলাম দাদা, তোমার এই হেমন্তবাবু কিন্তু সত্যিই একটু বেয়াড়া বেয়াড়া।'

নীলকমল বলল, 'তা হোক, কাজকর্ম ভালো করলেই হোল। খুঁটিনাটি ব্যাপারে ওদের একটু স্বাধীনতা দিস। হাতের কাজ তো, বার বার যদি হাত টেনে ধরিস — এটা কোরো না, ওটা কোরো না, তাহলে ওদের হাত চলবে না। নিজেদের মর্জি-মাফিক ওদের খানিকটা চলতে দিতে হয়, না হলে ক্ষতি হয় কাজকর্মের। আমাদের দেখতে হবে ব্যবসার সুবিধা অসুবিধা।'

কিন্তু উপদেশটা ঠিক যেন মনঃপূত হয় না ঊর্মিলার। ব্যবসার সুবিধা অসুবিধাই কি সবটুকু? নিজের পছন্দ নেই? নিজের পছন্দমত জিনিস নিজের হাতে করবার, নিজের চোখে দেখবার আনন্দ নেই আলাদা? তার নিজের ঘরের এক দেয়ালের একখানা ফটো আর এক দেয়ালে মা যদি টাঙিয়ে রাখে, ঊর্মিলার মন খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে। তার র‍্যাকের একখানা বই যদি দাদা তুলে নিয়ে যেমন তেমন ক'রে বিছানার ওপর ফেলে রাখে, মনে মনে ভারি রাগ হয় ঊর্মিলার। ব্লাউসের হাতার প্যাটার্ণ যদি বউদি ঊর্মিলার পছন্দমত না ক'রে তার নিজের পছন্দমত করে, সে ব্লাউস গায়ে দিয়েও কেমন যেন খালি-গা খালি-গা মনে হয় ঊর্মিলার; আর এত বড় গোটা

একটা প্রেস, তার কাজকর্ম একজন বাইরের লোকের পছন্দ মত চলবে ? ব্যবসার খাতিরেও কথাটা মেনে নেওয়া শক্ত হয় ঊর্মিলার পক্ষে।

আরো একটা ব্যাপার দেখা গেল। শুধু নিজের পছন্দ খাটিয়েই হেমন্ত সন্তুষ্ট রইল না। ঊর্মিলার কাজকর্ম, পছন্দ অপছন্দের ওপরও মতামত আর মন্তব্য করতে সুরু করল।

অফিস ঘরে বসে ঊর্মিলা সেদিন একটা জরুরী চিঠি টাইপ করছে, হেমন্ত একটা গ্যালি হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত হোল, 'এ প্রুফ আপনি দেখেছেন ?' ঊর্মিলা চোখ তুলে বলল, 'হ্যাঁ, কি হয়েছে প্রুফের ?' হেমন্ত মৃদু হাসল, 'হয়নি কিছু। তবে আইনগুলি যেমন চলতি আছে, সেভাবে হলে খুব ভালো হয়। ভুল ধরতে সুবিধা হয় কম্পোজিটারদের। সমস্ত শব্দটা কেটে দেবেন না। যেমন ধরুন এই হৃদয় শব্দটা। তারপর দেখুন এই নির্মম। রেফটা পড়েনি। রেফটা বুঝিয়ে দিতে হলে —'

ঊর্মিলা বলল, 'থাক থাক, আপনাকে আর বোঝাতে হবে না। হরিবাবুর সময় আমি তো ওই রকমই দেখতাম। তিনি তো বলেন নি কিছু।'

হেমন্ত বলল, 'বলতে বোধ হয় তিনি সঙ্কোচ বোধ করেছেন। তা ছাড়া ভেবেছেন, এই সব জিনিস তো আপনার শিখবার কথা নয়, দয়া ক'রে যতটুকু শিখেছেন ততটুকুই ভালো।'

ঊর্মিলা বলল, 'হুঁ, আর আপনি কি ভাবেন ?'

হেমন্ত বলল, 'আমি বলি শিখলেনই যখন, একটু ভালো করেই শিখুন। সব বিছাই তো বিছা।'

ঊর্মিলা বলল, 'আচ্ছা, আপনি এখন যান।'

কিন্তু হেমন্তর কথাটা ঊর্মিলা ঠিক অগ্রাহ্য করতে পারল না। হেমন্তর প্রুফ দেখার পদ্ধতিটা আরো সুবিধাজনক সে কথা মনে মনে স্বীকার করল। তাছাড়া মনে হোল কর্মচারী বলে লোকটি সব সময় মাথা নিচু ক'রে বিনয় না দেখালেও খুব উদ্ধতও তো ওকে বলা যায় না। সম্পূর্ণ রূঢ়ভাষীও তো নয়। বরং যখন বলল, 'শিখলেনই যখন, একটু ভালো ক'রেই শিখুন।' কথাটার মধ্যে তখন যেন বেশ একটু মমত্ব, বেশ একটু মাধুর্যের সুরই ধরা পড়ল ঊর্মিলার কানে। হরিবাবুও সস্নেহে তাকে সব শেখাতে চেয়েছেন, কিন্তু হেমন্ত তাকে যেন আরো ভালো ক'রে শেখাতে চায়। তা চায় চাক। শিখতে ঊর্মিলার আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে হেমন্ত যেন ভুলে না যায়, ঊর্মিলা তার মনিব, ছাত্রী নয়।

আর একদিন ; 'নব পত্রিকা' নামে একটি মাসিকপত্র ছাপা হয় ঊর্মিলাদের প্রেস থেকে। মেয়েদের কথা বিভাগে ঊর্মিলা নিজেই সেই সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছে তাতে। বিষয় 'স্বদেশী আন্দোলনে নারী'। প্রবন্ধ রচনায় অবশ্য অনেক সাহায্য করেছে নীলকমল। জায়গায় জায়গায় নতুন ক'রে

প্যারাগ্রাফ্ লিখে দিয়েছে। উর্মিলা একটু খুঁৎখুঁৎ করলেও তেমন আপত্তি করেনি। কারণ দাদার লেখাটা ভালোই হয়েছে তার চেয়ে। কিন্তু মেক-আপের সময় উর্মিলা যে-রকম বলে দিয়েছিল, হেমন্ত একেবারে তা আমূল পালটে দিল। কয়েক-জন নেত্রীর ব্লক যাবে প্রবন্ধটায়। তাদের স্থান অদল বদল ক'রে দিল হেমন্ত।

মেক-আপ প্রুফটা দেখে উর্মিলা নিজে ছুটে গেল হেমন্তর কাছে, কৈফিয়ৎ তলবের সুরে বলল, 'আপনি কার কথামত এমন করেছেন?'

হেমন্ত বলল, 'কারো কথামত করিনি। মনে হোল লে-আউটটা এইরকম হোলেই ভালো হবে। অবশ্য আপনি যে ভাবে করেছিলেন সেটাও রেখে দিয়েছি, এই দেখুন। যেটা আপনার পছন্দ হয়, সেটাতেই প্রিন্ট অর্ডার দিন।'

দুটো জিনিসই তুলনা ক'রে দেখল উর্মিলা। মনে মনে স্বীকার করল হেমন্তর করা পেজের মেক-আপটাই ভালো হয়েছে। ঠিক ঠিক জায়গায় বসেছে ব্লকগুলি। একবার উর্মিলা ভাবল নিজের হুকুমই বহাল রাখে, নিজের নির্দেশ দেওয়া মেক-আপটাই চালিয়ে দেয়, কিন্তু কেমন যেন বাধো-বাধো লাগল। দেখতে যখন হেমন্তরটাই ভালো দেখাচ্ছে, ওইটাই থাক। দাদার সংশোধনটা যেমন খুঁৎখুঁতি সত্ত্বেও মেনে নিয়েছিল, হেমন্তর সংশোধনও তেমনি ক'রে মেনে নিতে

ইচ্ছা করল। মুখে অবশ্য হেমন্তর কৃতিত্ব উর্মিলা তেমন স্পষ্ট স্বীকার করল না, বলল, 'দিন তাহলে আপনারটাই। খেটে খুটে যখন করেছেন। কিন্তু দেখবেন যেন খারাপ না দেখায়।'

হেমন্ত বলল, 'খারাপ দেখালে কি আর দিতাম? ইচ্ছা ক'রে নষ্ট করতাম আপনার জিনিস?'

'আপনার জিনিস!' কথা দুটির মধ্যে কেমন যেন একটু আপন-আপন সুরু আছে বলে মনে হোল উর্মিলার। কাজ-কর্ম হেমন্ত ভালোই বোঝে, সেই সঙ্গে স্বীকার করে নিতে ঠিক যেন আগের মত কষ্ট হোল না।

জ্বরের জন্য দু'তিন দিন ধ'রে কামাই হচ্ছে হেমন্তর। উর্মিলা তার জায়গায় নির্দেশ উপদেশ দিতে লাগল নিম্নতম কম্পোজিটারদের। উর্মিলা দেখল তারা ঠিক আগের মত খুঁৎ খুঁৎ করছেনা; কেননা নির্দেশটা উর্মিলার মুখ থেকে বেরুলেও নির্দেশের ধরণটা অবিকল হেমন্তর মত।

জন দুই কমতি আছে কম্পোজিটারের। খানিকটা ম্যাটার নিয়ে নিজেই কম্পোজ করতে বসল উর্মিলা। কম্পোজিং সম্বন্ধেও কম্পোজিটারদের কিছু নতুন রকমের উপদেশ নির্দেশ দিয়ে গেছে হেমন্ত। সে সব অনুসরণ করলে কাজ আগের চাইতে তাড়াতাড়ি এবং ভালো রকমের হয় কিনা একটু পরীক্ষা ক'রে দেখবার সাধ গেল উর্মিলার। নিজের জন্য আলাদা টাইপ কেস, আলাদা বসবার জায়গা রাখাই আছে। অন্য

কোন কম্পোজিটারের সেখানে যাওয়ার হুকুম নেই। আর কোথাও সীট না পেলে নীলকমলের আদেশ নিয়ে কেবল হেমন্তই সেখানে কদাচিৎ দু'একদিন গিয়ে বসে। সেদিন উর্মিলা গিয়ে বসল হেমন্তর পদ্ধতি পরীক্ষা করবার জন্য। কাজ স্থুরু ক'রেই খুসিতে মুখ ভ'রে উঠল উর্মিলার। হেমন্ত মিথ্যা বলেনি। তার নির্দিষ্ট ধরণে কাজ করলে সত্যিই বেশ স্থুবিধা হয় কাজে।

মিনিট পনেরর মধ্যে একটা পেজ প্রায় কম্পোজ ক'রে এনেছে উর্মিলা, গন্ধর্ব এসে খবর দিল, 'দিদিমণি, এক বাবু খুঁজছেন দাদাবাবুকে।'

উর্মিলা বলল, 'দাদাকে? তিনি তো পেপার কণ্ট্রোল অফিসে গেছেন। কি নাম, কি দরকার?'

বলতে বলতে উর্মিলা নিজেই উঠে এল। বাইরের কেউ এলে নীলকমল না থাকলে ইদানীং হেমন্তই গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু ওদের দুজনের কেউ যখন নেই, উর্মিলা নিজেই উঠে গেল তাড়াতাড়ি। নানা জরুরী কাজে বাইরের পার্টি সব আসে। গন্ধর্ব কি বলতে কি বলে ফেলবে তার ঠিক কি?

কিন্তু প্রেস ঘর থেকে বেরুতেই উর্মিলা একেবারে থমকে দাঁড়াল। সামনা সামনি দাঁড়িয়ে সরিৎ। মুহূর্তকাল সরিৎও নির্বাক পলকহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বলল, 'আমি নীলকমলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

উর্মিলা একটুকাল চুপ ক'রে রইল, তারপর বলল, 'দাদা বেরিয়ে গেছেন।'

সরিৎ বলল, 'হ্যাঁ, তাও শুনলুম তোমাদের বেয়ারার কাছে।'

উর্মিলা একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে, 'তা শুনেও দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? আর দাদার সঙ্গে দেখা করবারই কি দরকার তোমার?'

কিন্তু জিজ্ঞেস করল না। কি হবে অত কথা বলে? কোন কথা বলবার প্রয়োজনই কি আর আছে?

সরিৎ বলল, 'নীলকমলের সঙ্গে দেখা হোল না। তাকে ব'লো তার সেই নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তখন আমাদের ফার্মেরই একটা জরুরী কাজে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার সময় পাইনি। তারপর ভাবলাম খালি হাতে এসেই বা লাভ কি। বইটা বেরুলেই আসব। নীলকমলের প্রেসের মুখ দেখব আমার কবিতার বই দিয়ে। কাল সেই বইটা বেরিয়েছে। তাকে দিয়ো।'

কালো রঙের একখানা চটি বই উর্মিলার দিকে বাড়িয়ে ধরল সরিৎ। কিন্তু উর্মিলা সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াল না, বলল, 'বইটায় দাদার কোন দরকার আছে কিনা তাতো জানিনে। তাঁর বিনা অনুমতিতে কি ক'রে নিই?'

সরিতের অকুণ্ঠ আচরণে মনে মনে বিস্মিত হোল উর্মিলা। অবাক হয়ে ভাবল মানুষ কতখানি নির্লজ্জ হলে অত কাণ্ডের পরও ফের এমন ক'রে বই উপহার দিতে আসতে পারে। না কি, সে সব দিন দেড় বছর পিছনে পড়েছে বলেই সকলের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে বলে ভেবেছে সরিৎ? তার সমস্ত অপরাধ চাপা পড়ে গেছে দেড় বছর সময়ের নিচে? আঠার মাস গা ঢাকা দিয়ে থেকে সরিৎ কি ভেবেছে সমস্ত কিছু ঢাকা পড়ে গেছে?

উর্মিলার দিকে আর এক মুহূর্ত অপলকে তাকিয়ে থেকে সরিৎ বলল, 'আচ্ছা বই দিতে আমি তাহলে বরং আর একদিনই আসব। কিন্তু তোমার হাতে ওসব কি উর্মিলা? ডান দিকের ভ্রূর ওপরেই বা কিসের দাগ? ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছে তো?'

এবার উর্মিলার খেয়াল হোল। তাড়াতাড়িতে হাত না ধুয়েই বেরিয়ে এসেছে। একটু অপ্রতিভ হয়ে উর্মিলা বলল, 'কম্পোজ করছিলাম। বোধ হয়, প্রেসের কালিই লেগে থাকবে।'

সরিৎ বলল, 'ও, প্রেসের কালি, তাই বল। কি বললে, কম্পোজ করছিলে? — নিজের হাতে কম্পোজও করতে জানো নাকি তুমি?'

উর্মিলা বলল, 'জানি।'

দু' একজন কম্পোজিটার উঁকি মারছিল প্রেস ঘর থেকে। ঊর্মিলা বলল, 'আপনার যদি আরো কিছু বলবার থাকে অফিসের ভিতরে আসুন।'

শেষের কয়েক মাস দাদার এই বিশিষ্ট বন্ধুটি আর 'আপনি' ছিল না ঊর্মিলার কাছে, 'তুমিতে' নেমে আপনতর হয়েছিল। কিন্তু সে অতীতের ঘটনা। আজ ইচ্ছা ক'রেই ফের 'আপনি' সুরু করল ঊর্মিলা। সরিৎ তা লক্ষ্য ক'রেও কোনও কথা বলল না। ঊর্মিলার পিছনে পিছনে এসে তার সামনের চেয়ারে বসল। আধা পরিচিত, অপরিচিত, অনেক লোককে তারপর সামনে নিয়ে বসেছে ঊর্মিলা, প্রেসের ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলেছে। আজ সরিৎও তাদেরই একজন। ঘরে এসে সামনের চেয়ারে বসলেও সে সম্পূর্ণ বাইরের লোক। তার সামনে বসতেও আর কোন ভয় নেই ঊর্মিলার। একটু চুপ ক'রে থেকে ঊর্মিলা বলল, 'হ্যাঁ, বলুন কি বলছিলেন। কম্পোজ করতে আমি জানি। আর কিছু বলবার আছে আপনার?'

সরিৎ বলল, 'না। আর যা বলবার আছে তা মুখের কথায় বলা যায় না, কবিতায় বলা যায়। কোন কোন জায়গায় প্রেসের কালি যে অপরূপ প্রসাধনের বস্তু হয়ে ওঠে তা আজ এই প্রথম দেখলাম।'

ঊর্মিলা বলল, 'এবার আরো একটা জিনিস আপনাকে

দেখান দরকার।' বলে খোলা দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলে উর্মিলা।

একবার যেন ফ্যাকাসে দেখাল সরিতের মুখ, তারপর আরক্ত হয়ে উঠল।

'আচ্ছা।' বলে সরিৎ এবার উঠে দাঁড়াল, 'নীলকমলকে বোলো আমি এসেছিলাম।'

ঘর থেকে নেমে ছোট্ট উঠান পেরিয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সরিৎ। কিন্তু উর্মিলার যেন আর উত্থানশক্তি নেই। চেয়ারের সঙ্গে কে যেন তাকে পেরেক দিয়ে গেঁথে রেখে গেছে। মিনিট কয়েক বাদে উর্মিলার খেয়াল হোল কালো রঙের বইটা টেবিলের ওপরই পড়ে রয়েছে। সরিৎ সেটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় নি। উর্মিলা একবার ভাবল বইটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর একবার তার মনে হোল, না ছোঁয়াই ভালো। তৃতীয় বার কৌতূহলই জয়ী হোল। বইটা তুলে নিয়ে উর্মিলা ওপরের নামটা পড়ল, 'কলস্বর।' কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ আর কয়েকটি গদ্য কবিতার সমষ্টি, বেশির ভাগই পুরোন রচনা। দাদার টেবিলের চিঠির প্যাডে, হলদে রঙের হ্যাণ্ডবিলের পিঠে, হাতের মুঠির ভিতরে গুঁজে দেওয়া টুকরো কাগজে এসব কবিতার অনেকগুলিই উর্মিলা দেখেছে। কিন্তু তখন এগুলির যা মানে ছিল, আজ আর তা নেই। ছাপার অক্ষরে একেবারে আলাদা হয়ে গেছে চেহারা। তবু মাঝে

মাঝে দু' একটি পংক্তি চোখে পড়ল ঊর্মিলার। এক জায়গায় আছে ঃ

'মানে কিছু না হয় না হোক
ছড়ানো থাকুক শুধু দু' চারিটি শ্লোক
মুখে মুখে, কানে কানে, দূরের চিঠিতে,
কিছু বা উদ্ধৃতি তার
গোপন গানের খাতাটিতে।'

ঊর্মিলার মনে পড়ল তার গানের খাতার জন্য সত্যিই গুটি কয়েক গান একবার রচনা ক'রে দিয়েছিল সরিৎ। কিন্তু সেই একই গান আরো কতজনের খাতায় সে লিখে দিয়ে এসেছে তার ঠিক কি? হয়তো সে গানগুলি এখন পর্ণার খাতাতেও লেখা রয়েছে। একই গান নানা জনের কানের কাছে গুণ গুণ করাই এদের পেশা। কিন্তু ঊর্মিলার দাদাকে বই উপহার দিতে সরিৎ কেন এল এতদিন পরে? বইটা কি লক্ষ্য না উপলক্ষ্য? এই অজুহাতে একবার কেমন আছে ঊর্মিলারা তাই দেখবার কৌতূহল হয়েছে সরিতের? বইটা ফেলে দেওয়াই উচিত ছিল কিন্তু টেবিলের এক ধারে সেখানা সরিয়ে রাখল ঊর্মিলা। প্রেস ঘরে গিয়ে ঢুকল না, নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল, দেখল সত্যিই খানিকটা কালির দাগ লেগে আছে ভ্রূর একটু ওপরে। আঁচলের কোণ দিয়ে ঘসে ঘসে তুলল সেই কালি।

নিভাননী এসে দাঁড়ালেন পিছনে, 'উর্মি কার সঙ্গে কথা বলছিলি, সরিতের গলা বলে মনে হোল যেন।'

ঊর্মিলা বলল, 'হ্যাঁ, সেই এসেছিল।'

নিভাননী বললেন, 'সেই এসেছিল! এত দুঃসাহস তার! আর তুই কিনা তার সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বললি! লজ্জা হোল না, ঘৃণা হোল না? আমি হলে তো থুথু ছিটিয়ে দিতুম।'

ঊর্মিলা বলল, 'আমিও থুথুই ছিটিয়েছি মা।'

নীলকমলও ফিরে এসে টেবিলের ওপর দেখল সরিতের কবিতার বই, বলল, 'এ কি?'

ঊর্মিলা বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ।'

নীলকমল বলল, 'তা পাচ্ছি। কিন্তু কি ক'রে এল বুঝতে পাচ্ছি না।'

ঊর্মিলা বলল, 'বোঝা এমন কি আর কঠিন। তোমার বন্ধু তোমার জন্য উপহার রেখে গেছে।'

নীলকমল বলল, 'তুই রাখলি কেন।'

ঊর্মিলা বলল, 'আমি কেন রাখতে যাব। প্রেস খোলার সময় তুমি নিমন্ত্রণের চিঠি দিয়েছিলে, এ তারই লৌকিকতা।'

নীলকমল গম্ভীরমুখে বইটা একবার নেড়ে দেখল, তারপর হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝের ওপর।

ঊর্মিলা মৃদু একটু হাসল, কোন কথা বলল না, বইটা তুলতে চেষ্টা করল না।

পরদিন সেই বই এসে তুলল হেমন্ত, 'আহাহা, বইটা এমন ক'রে নষ্ট হচ্ছে কেন। বাঃ। চমৎকার গেট-আপ তো! দেখেছেন কি সুন্দর ছাপা আর বাঁধাই?'

ঊর্মিলা একটু হাসল, 'দেখেছি। গেট-আপ আর ছাপা বাঁধাই ছাড়া বইয়ের আর কিছু বুঝি আপনার চোখে পড়ে না? কতদূর অবধি পড়াশুনো করেছিলেন?'

হেমন্ত জবাব দিল, 'বেশি দূর নয়।'

ঊর্মিলা বলল, 'তবু শুনি।'

হেমন্ত বলল, 'কি করবেন শুনে? সেকেণ্ড ক্লাস অবধি উঠেছিলাম।'

ঊর্মিলা বলল, 'ও, তবে তো অনেক দূর উঠেছিলেন। লজ্জার কি আছে? আমার বিদ্যাও ওই পর্যন্তই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঢের শিখেছি। যা পেশা তাতে দুজনেরই অক্ষর পরিচয় পর্যন্তই তো যথেষ্ট ছিল। কি বলেন?'

কথার মধ্যে হঠাৎ একটু ঘনিষ্ঠতার সুর ফুটে উঠেছে টের পেয়ে ঊর্মিলা নিজেই কেমন যেন বেশ লজ্জিত হয়ে পড়ল। তার মুখের দিকে হেমন্ত যে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে ছিল তাও লক্ষ্য করল সেই সঙ্গে।

ঊর্মিলা তাড়াতাড়ি সচেতন হয়ে বলল, 'আচ্ছা, কাজে যান আপনি। ওকি, বইটা নিয়ে চললেন নাকি?'

হেমন্ত ফিরে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

ঊর্মিলা বলল, 'কিন্তু না বলেই নিচ্ছিলেন যে।'

হেমন্ত বলল, 'ও, আমি ভেবেছিলাম এ বইতে আপনাদের আর দরকার নেই।'

ঊর্মিলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, 'কি ক'রে বুঝলেন?'

হেমন্ত মৃদু হাসল, 'মাটিতেই পড়ে ছিল তো। বইটা কি নেব, না রেখে যাব?'

ঊর্মিলা একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'না, এখন থাক। দরকার হয় তো পরে নেবেন।'

হেমন্ত ঘাড় নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

হেমন্ত প্রেস ঘরে গিয়ে ঢুকলে ঊর্মিলার মনে হোল বইটা ওকে দিলেও হোত। কবিতাগুলির কিইবা বুঝত হেমন্ত। আর বুঝলেই বা ক্ষতিই ছিল কি।

কিন্তু আশ্চর্য, অমন করে অপমানিত হওয়ার পরেও সরিৎ আরো একদিন এসে উপস্থিত হোল। এবার আর নতুন কোন কবিতার বই নিয়ে নয়, খান কত বইয়ের অর্ডার নিয়ে। সরিতের কোন এক বন্ধু আছে পাবলিশার। তার প্রেস নেই, বাইরের প্রেস থেকে বই ছাপায়। নীলকমল কি কিছু কিছু বই ছাপবার ভার নিতে পারে? যা বাজার দর তার চাইতে বরং দু'চার টাকা বেশিই দিতে পারে সরিতের বন্ধু। দরকারটা তার জরুরী।

অফিস ঘরে ঊর্মিলা বসে কি একটা চিঠি টাইপ করছিল,

সরিতের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিজের কাজে মন দিল, কোন কথা বলল না।

নীলকমল ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, বইয়ের কাজ আমাদের প্রেসে আপতত হবে না।'

হেমন্ত কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, 'হবে না কেন নীলকমলবাবু, খুব হবে। আমি ভার নিলুম কাজ তুলে দেওয়ার।'

সরিৎ এবার কৌতূহলী হয়ে তাকাল হেমন্তর দিকে, তারপর নীলকমলের দিকে ফিরে চেয়ে বলল, 'এটি আবার কে?'

'আমাদের হেড কম্পোজিটার।'

সরিৎ একটু হাসল, 'ও, আপনারা পারবেন কাজ তুলে দিতে?'

হেমন্ত বলল, 'তা পারব বই কি।'

সরিৎ বলল, 'তাহলে ভেবে দেখ নীলকমল। কম্পোজিটাররা পারে। এখন তোমরা পার কি পার না, ইচ্ছা করলে এখনো আমাকে জানাতে পারো, পরেও পারো খবর দিতে।'

নীলকমল বলল, 'আচ্ছা, সে কথা তোমাকে পরেই জানাব সরিৎ।'

এবার কৌতূহলী হয়ে উঠল হেমন্ত, বলল, 'আপনার নামই কি সরিৎ মুখোপাধ্যায়?'

সরিৎ বলল, 'হ্যাঁ, আমারই নাম। কেন বলুন তো ?'

হেমন্ত বলল, 'আপনার একখানা কবিতার বই দেখছিলাম সেদিন।'

সরিৎ বলল, 'তাই নাকি ? কেমন লাগল বলুন তো।' এতক্ষণে মনে হোল সরিতের — নীলকমলরা তার বইটার কথা এখন পর্যন্ত উল্লেখ করে নি।

হেমন্ত বলল, 'বেশ হয়েছে। কোন্ প্রেসে দিয়েছিলেন বলুন তো। চমৎকার ছেপেছে।'

'ও।' কৌতুকে উছলে উঠল সরিতের চোখ, 'আপনাদের প্রেসে বই দিলে পারতেন অমন ছাপতে ?'

হেমন্ত বলল, 'চেষ্টা ক'রে দেখতে পারতাম।'

খানিক বাদে উঠে গেল সরিৎ। যাওয়ার আগে আর একবার তাকিয়ে গেল ঊর্মিলার দিকে। নিবিষ্ট মনে সে টাইপ ক'রে যাচ্ছে।

নীলকমল এবার ধমক দিল হেমন্তকে, 'আপনাকে আগু বাড়িয়ে কথা বলতে কে বলেছিল ?'

হেমন্ত বলল, 'কেউ বলেনি। ফুরনে কাজ করে কম্পো-জিটাররা। কদিন ধ'রে তো তেমন কাজ নেই। কাজ হাতে না পেলে ওরা পয়সা পাবে কি ক'রে ?'

ঊর্মিলা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হেমন্তবাবু ঠিকই বলেছেন দাদা। আমাদের ব্যবসা নিয়ে কথা। বইয়ের কাজ নিলে

যদি লাভ থাকে মনে করো তাহলে নিতে তো কোন ক্ষতি নেই। সে কাজ সরিৎবাবুর মারফৎই আসুক আর অন্য কারো মারফৎই আসুক, একই কথা।'

নীলকমল বলল, 'আচ্ছা, হেমন্তবাবু, আপনি এবার যেতে পারেন।' তারপর উর্মিলার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি তোর কথাই ভাবছিলাম উমি। তোর যদি কোন অমত না থাকে, আমারও কোন আপত্তি নেই।'

উর্মিলা মনে মনে হাসল। দাদার যে আপত্তি নেই তা সে বুঝতে পেরেছিল। নীলকমলের দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা তার চোখ এড়ায়নি। যে জন্যই হোক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগটা আবার সে ফিরিয়ে আনতে চায়। চক্ষুলজ্জাটা কেবল উর্মিলার জন্য। কিন্তু সরিতের উদ্দেশ্য ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারলনা উর্মিলা। সরিৎ কেন আবার যাতায়াত সুরু করল? এ কি কেবল বন্ধুপ্রীতি? হারান বন্ধুকে ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা না অন্য কিছু? সরিতের চোখে যে আগ্রহ, যে ঔৎসুক্য, যে মুগ্ধতা ফুটে উঠেছে তার হেতুটা কি? তার সুশ্রী, বিদুষী স্ত্রী আছে ঘরে। উর্মিলার প্রতি অকৃষ্ট হওয়ার তার কোন কারণই নেই। তবে কি সরিৎ যা বলেছে তাই সত্যি? প্রেস আর প্রেসের কালিই সরিতের মনে নতুন মোহের সৃষ্টি করেছে? 'তুমি কম্পোজ করতেও পার?' সরিৎ সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল উর্মিলাকে। সে প্রশ্নের মধ্যে কেবল কৌতূহল নয়,

কৌতুক নয়, সপ্রশংস বিস্ময়ও ফুটে উঠেছিল। নীলকমলের অনেক বন্ধু এর আগে ঊর্মিলার কৃতিত্বের প্রশংসা করেছে। বলেছে, প্রেস যে হোল, প্রেসের যে উন্নতি হচ্ছে, তা কেবল ঊর্মিলারই যোগ্যতায়। কিন্তু সরিতের প্রশংসায় মনটা অন্য-রকম ভাবে খুসি হয়ে উঠল। হওয়া উ.চিত নয়, ঘৃণা হওয়াই উচিত, তবু ঘৃণার সেই তীব্রতা মনের মধ্যে যেন আনতে পারলনা ঊর্মিলা। ভাবল সরিতের মুগ্ধতার পরিমাণটুকু এবার ঊর্মিলা লক্ষ্য ক'রে দেখবে। পুরুষের মুগ্ধদৃষ্টিকে তো আজ আর ততখানি ভয় নেই তার। সময়মত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পুরুষের সেই মোহকে কি ক'রে দগ্ধ করতে হয় ঊর্মিলা তা জানে।

কিন্তু আপত্তি করলেন সারদাবাবু। ছেলে মেয়ে দুজনকে ডেকে ফের আর একবার ধমকে দিলেন, 'জাত মান বুঝি আর তোরা রাখবিনে। ফের সেই সরিৎ আমার বাড়িতে পা দেয় কোন্ সাহসে? ওর সঙ্গে কোন সংশ্রব যদি রাখিস, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। এ বাড়ি থেকে প্রেসও তুলে নিয়ে যেতে হবে।'

সন্তান হবার উপলক্ষ্যে দীর্ঘদিনের জন্য বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় নীলকমলের স্ত্রী মণিমালাও বলল, 'সত্যি ভাই ঠাকুরঝি, এসব ভালো দেখায় না। তোমরা দুই ভাইবোনে মিলে সুরু করলে কি? ব্যবসায় নেমেছ বলে নিজেদের মান সম্ভ্রমও বিসর্জন দিয়েছ নাকি?'

ঊর্মিলা বলল, 'বউদি, তুমিও যে একেবারে ঠানদি সেজে উপদেশ দিতে সুরু করলে। ব্যাপারখানা কি ?'

মণিমালা বলল, 'ঠানদি হব কেন ঠাকুরঝি। বউদি হয়েও বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু বুঝেও তো কিছু করবার জো নেই। তোমাকে মন বাঁধতেই হবে।'

নিভাননী আর একবার বিয়ের কথা তুললেন। কিন্তু কথাটা বেশীদূর এগুতে পারল না। সারদাবাবু হঠাৎ মারা গেলেন। আর সেই শোকসন্তাপ কিছুটা হ্রাস হতে না হতে ধরা পড়ল নীলকমলের টি, বি, হয়েছে। কিছুদিন থেকেই তার অবসাদের ভাবটা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সবাই ভেবেছিল এটা নীলকমলের স্বাভাবিক উৎসাহহীনতা। প্রেসের নেশাটা হয়তো তার কাছে পুরোন হয়ে এসেছে। কিন্তু মানসিক অবসাদের মূল কারণ আবিষ্কার ক'রে সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

নিভাননী বললেন, 'ওই প্রেসই সর্বনাশের মূল। প্রেসের জন্য খেটে খেটেই এই দশা হয়েছে ওর। ভালো চাওতো এখনও ওই প্রেস বিক্রি ক'রে দাও।'

কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার আগে নীলকমল ঊর্মিলাকে বলে গেল, 'খবরদার, প্রেসের যেন কোন ক্ষতি না হয় উমি। প্রেসের ভার আমি তোর ওপরই দিয়ে গেলাম।'

ঊর্মিলা বলল 'কতদূরে যেন যাচ্ছ যে ভার টার সব দিয়ে

গেলে। যাদবপুরে বসে রোজকার খবর তোমাকে রোজ পাঠাব। প্রেসের জন্য একটুও ভেব না। আমি থাকতে ওর কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।'

এই দুঃসময়ে এসে সরিৎও দাঁড়াল পাশে, বলল, 'ভয় কি নীলু, আমি আছি।'

হাসপাতালে ভর্তি হবার সময় যথেষ্ট সাহায্য করল সরিৎ। নিভাননী তার আগেকার অপরাধ প্রায় ভুলে যেতে বসলেন। ভুল মানুষের হয়, সে ভুল মানুষ আবার শোধরায়ও। তার সব দোষ, সব অপরাধ কি সব সময় মনে রাখা চলে, না মনে রেখে পারা যায়? কত প্রয়োজন জীবনে, কতরকম কত দাবী। সে দাবীর কাছে অনেক কিছু ছাড়তে হয়, অনেক কিছু ভুলতে হয়। আপোষ করতে হয় জীবনের সঙ্গে, পোষ মানতে হয়।

নিয়োগপত্র কেউ সরিৎকে দিল না। তবু অলিখিত ভাবে সরিৎই পদ পেলে ম্যানেজারের। ওরা দু'তিন পুরুষের ব্যবসায়ী। ব্যবসাবুদ্ধি নীলকমলের চাইতে সরিতের অনেক পাকা। খাতায় কেবল ছন্দ মিলাতেই জানে না, হিসাব মিলাতেও জানে। কেবল বুদ্ধিই খাটাল না সরিৎ, নিজের কিছু মূলধনও খাটাতে দিল ধার হিসাবে।

যুদ্ধের বাজারের অনুকূল হাওয়ায় ফেঁপে উঠল প্রেস। আনন্দ খাঁ লেনের ছোট্ট গলিতে আর তাকে ধরে রাখা যায়

না। কাজের এত চাপ যে ট্রেড্‌ল্‌ মেসিনে আর কুলোয় না। হাজার পঁচিশেক টাকা খরচ ক'রে কেনা হোল ফ্ল্যাট মেসিন। বি, কে, পাল এভেনিয়ুর গোটা একটা দোতালা বাড়ি নেওয়া হোল ভাড়া। সরিতের পরিকল্পনা হোল কেবল প্রেস নয়, দৈনিক কাগজও বের করা হবে সেখান থেকে। আপাতত মাসিক সাপ্তাহিকের আয়োজন চলতে লাগল। হাসপাতাল থেকে প্রায় সব বিষয়েই নীলকমলের অনুমোদন পাওয়া গেল। আপত্তির কারণ ছিল না। মূলধন সমান না হলেও অংশ বন্ধুকে অর্ধেকই লিখে দিয়েছে সরিৎ। বন্ধুকৃত্যে ত্রুটি হয় নি।

কিন্তু পাড়া ভরে, সমস্ত বন্ধু মহলে ততদিনে গুঞ্জরণ উঠেছে, নীলকমলই কেবল অর্ধাংশ পায়নি সারদা প্রেসের, ভিতরে ভিতরে অর্ধাঙ্গিনীও হয়ে উঠেছে উর্মিলা। এবার প্রকাশ্যভাবে হলেই হয়। ঢাক ঢোল পিটিয়ে গিয়ে উঠলেই হয় সরিতের বিড়ন ষ্ট্রীটের বাড়িতে। যাদবপুর হাসপাতালে দুজনকে এক সঙ্গে যেতে দেখা গেছে নীলকমলের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। কোনদিন ট্রামে বাসে, কোনদিন ট্যাকসীতে, কোনদিন বা সরিতের নিজের মোটরে। অবশ্য নিভাননী সঙ্গে রয়েছেন তাদের। কিন্তু অন্যান্য বন্ধুরা গুজব তুলেছে তিনি সবদিন সঙ্গে থাকেন নি। তাছাড়া থাকলেই বা কি? মোটরের রাস্তা তো কেবল যাদবপুর হাসপাতালের দিকেই নেই, আরো নানা

দিকেই রয়েছে। প্রেসের কাজকর্মেরও অন্ত নেই। সে কাজকর্মের অনেক সুরাহা হয় একসঙ্গে বেরুলে।

আটকে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন নিভাননী। ঊর্মিলা নিজেও কি চেষ্টা করেনি নিজেকে আটকাতে? কিন্তু বাঁধ এক মুহূর্তে গড়েছে, আর এক মুহূর্তে ভেঙেছে। তারপর একদিন সরিতের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ঊর্মিলা বলল, 'কি উপায় হবে আমার?'

সরিৎ বলল, 'উপায়ের জন্য ভাবছ কেন? পর্ণার জন্যই তো ভাবনা। ডাইভোর্স তো ওর নিজেরই চাওয়া উচিত। যদি নাই চায় তাতেই বা কি। কলকাতা সহরে বাড়ি তো কেবল আমার বিডন ষ্ট্রীটেই নেই। অন্য জায়গায়ও আছে। সেখানে গিয়ে উঠব।'

ঊর্মিলা অদ্ভুত একটু হাসল, 'তোমার বাগান বাড়ি?'

সরিৎ বলল, 'না, বাগান বাড়ি নয়। বাগান আলাদা, বাড়ি আলাদা। ইচ্ছা করলে নতুন প্রেস বাড়িটাতেই তো আমরা থাকতে পারি।'

ঊর্মিলা বলল, 'তা পারি। কিন্তু তার আগে —'

সরিৎ একটু হাসল, 'ও, তার আগে। কিন্তু তারও আগে আরো একটা জিনিস করবার আছে উমু। পর্ণাকে ডাইভোর্স চাইতে বাধ্য করতে হবে। না হলে বিয়েটা ঠিক আইনমতে সিদ্ধ হবে না। অবশ্য আইন ছাড়া তুমি যদি কেবল অনুষ্ঠান

চাও তাতেও রাজী আছি আমি। পুরোহিত আর শাঁখা সিঁদুরে আয়োজন যে কোন একদিন করলেই তো হয়।'

ঊর্মিলা বলল, 'ও সব কথা তুমি অমন ক'রে বলতে পারছ?'

সরিৎ বলল, 'পর্ণা বলাচ্ছে আমাকে। আমি ওকে বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই ও ডাইভোর্সে রাজী নয়। অথচ ওর কোন অসুবিধা নেই। সুন্দরী, শিক্ষিতা বড়লোকের মেয়ে। ওদের সমাজে যে এসব দু' একটা না হচ্ছে তাও নয়। ওর অনুরাগীর দল এখনো যথেষ্ট। সন্তানাদি হয়নি, কোন অসুবিধা হওয়ারই ওর কথা নয়।'

ঊর্মিলা মুখে হাত চাপা দিল সরিতের, 'অমন ক'রে বল না। ভুলে যেয়োনা আমিও তারই মত মেয়ে।'

সরিৎ একটু হাসল 'আচ্ছা, আচ্ছা, ভুলব না।'

বিডন ষ্ট্রীটে পড়ল গাড়ি। ঊর্মিলা বলল, 'ওকি, ওদিকে যাচ্ছ কোথায়?'

সরিৎ বলল, 'ভাবছি পর্ণার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি। বলে ক'য়ে আমি তো পারলাম না, তুমি যদি পারো।'

ঊর্মিলা বলল, 'না না না।'

সরিৎ হাসল 'ভয় পাচ্ছ? ভয়ের কিছুই নেই। শিক্ষিতা সুন্দরী হলে হবে কি, ভারী খেয়ালী মেয়ে। দেখনা এত কাণ্ডের পরও গলা জড়িয়ে রয়েছে।'

তেতলা বাড়িটার সামনে গাড়ি থামাল সরিৎ, হেসে বলল,

'সত্যিই যদি ভয় হয় তোমার, তোমাকে আর নামতে বলিনে। এর আগে তুমিই মাঝে মাঝে দেখতে চেয়েছ।'

তা চেয়েছে উর্মিলা। অনেকদিন তার কৌতূহল হয়েছে পর্ণাকে দেখবার জন্য। অনেক সুন্দরী, অনেক বিদুষী সে। উর্মিলা তার সম্বন্ধে বহু শুনেছে বহুজনের কাছে। সরিতের কাছেও শুনেছে। কিন্তু উর্মিলার অনুরোধ সত্ত্বেও সরিৎ তাকে কোনদিন পর্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয় নি। বলেছে পর্ণা ভারি লাজুক মেয়ে, ঘর থেকে বেরোয় না, কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও চায় না। উর্মিলা নিজেও যে একেবারে নিঃসংকোচ ছিল তা নয়। শত হলেও যার স্বামীকে সে ছিনিয়ে নিয়েছে তার সামনে কি করে সে উপস্থিত হয়? কিন্তু সরিতের বিদ্রূপ উর্মিলাকে উত্তেজিত করে তুলল। ভয়? ভয় সে কেন করতে যাবে পর্ণাকে? হোক সুন্দরী, হোক শিক্ষিতা, কিন্তু বিজয়িনী তো আজ উর্মিলাই। লজ্জা, সংকোচ, মান, মর্যাদা সমস্ত কিছুর বিনিময়ে উর্মিলা জয়ী হয়েছে। অন্যায়, অবিচার? উর্মিলার ওপরই কি অন্যায় অবিচার কম করেছে কেউ? তার কাছ থেকে পর্ণাই তো আগে ছিনিয়ে নিয়েছে সরিৎকে। নিজের হৃতধন উদ্ধার ছাড়া আর বেশি কি করেছে উর্মিলা? না, তার আর ভয় নেই, লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরাজিত শত্রুকে সে আজ প্রত্যক্ষ করবে। জবাব দেবে সরিতের বিদ্রূপের।

নিজেদের শোবার ঘরেই ঊর্মিলাকে নিয়ে গেল সরিৎ। পর্ণা পিঠের ওপর চুল ছড়িয়ে জানলার কাছে একখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী খুলে বসেছিল, সরিৎ তাকে ডেকে বলল, 'এই যে পর্ণা, এরই কথা বলছিলাম তোমাকে, ইনিই ঊর্মিলা। আমার —' একটু থেমে সরিৎ বলল, 'আমার বিজনেসের পার্টনার।'

মাথায় আঁচল টেনে দিল পর্ণা। ঊর্মিলার মনে হোল একবার যেন সাদা রক্তহীন হয়ে গেল পর্ণার মুখ, আর তার পরমুহূর্তে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে জমাট বাঁধল। কিন্তু তৃতীয় মুহূর্তে বেশ স্বাভাবিকভাবে হাত তুলে ঊর্মিলাকে নমস্কার জানাল পর্ণা, ঠোঁটের ওপর ক্ষীণ হাসির রেখা টেনে বলল, 'বসুন। আপনার কথা, আপনাদের প্রেসের কথা অনেক শুনেছি।'

ঊর্মিলার বুকে কি যেন একটা কাঁটার মত বিঁধল, দু'চোখে দুহূর্তের জন্য যেন ঝলক লাগল আগুনের। মেয়েদের রূপের সঙ্গে আগুনের শিখার তুলনা দেওয়া হয়। সে শিখা কি সত্যিই সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে পর্ণা? তারই মত একটি মেয়ে। ছিপ ছিপে, গৌরাঙ্গী। কিন্তু সুন্দরী মেয়ে তো আরো অনেক দেখেছে ঊর্মিলা, কাউকে দেখে এমন ক'রে তো জ্বালা ধরেনি বুকে।

পর্ণা আর একবার বলল, 'বসুন।'

নিজেকে আশ্বাস দিল উর্মিলা, বসবে বইকি ? বুকের জ্বালার এবার তার বাধা কি নিবৃত্তি ঘটাতে ? পর্ণা যদি দীপের শিখা মাত্র হয়, সে নিজে আগ্নেয়গিরি। হোক অপরিচ্ছন্ন অগ্নিকুণ্ড। কিন্তু আহুতি তো পেয়েছে সরিৎকে। জয় তো হয়েছে তারই।

উর্মিলা প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলল, 'না, আজ আর বসব না, কাজ রয়েছে।'

পর্ণা বলল, 'কাজের বাধা অবশ্য দিতে চাই না। কিন্তু এসেই চলে যাবেন ? একটু বসবেন না ? একটু চা টা —'

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল উর্মিলা, বলল, 'না আজ থাক, বরং আর একদিন —'

পর্ণা একটু হাসল, 'আর একদিন ? আচ্ছা।'

মোটরে ক'রে উর্মিলাকে পৌঁছে দিয়ে গেল সরিৎ। বলল, 'কেমন লাগল ?'

উর্মিলা বলল, 'কি জবাব তুমি আশা কর ?'

পরদিন যখন ফের দেখা হল সরিতের সঙ্গে উর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর ?'

'কি খবর তুমি আশা কর ?' একটু যেন গম্ভীর, একটু যেন থমথমে দেখাচ্ছে সরিতের মুখ।

শঙ্কিত স্বরে উর্মিলা বলল, 'কি হয়েছে ?'

সরিৎ একটু হাসল, 'ভয়ের কিছু নেই। যা আমরা

চাইছিলুম তাই হয়েছে, এতদিনে সুমতি হয়েছে পর্ণার। ডাইভোর্সে রাজী হয়েছে সে। তোমার যাওয়ার ফল একেবারে হাতে হাতে পাওয়া গেল।'

ঊর্মিলা বলল, 'পর্ণা হঠাৎ রাজী হোল কেন?'

সরিৎ একটু হাসল, 'রাজী হওয়ার খবরটা তোমার কাছে প্রীতিকর হলেও তার রাজী হওয়ার কারণটা তোমার কাছে তেমন সুখকর হবে না উর্মি।'

ঊর্মিলা বলল, 'তবু শুনি।'

সরিৎ বলল, 'সৌজন্য নয়, মহানুভবতা নয়, কেবল ঘৃণা। তোমার আমার ঘনিষ্ঠতার কথা পর্ণা তো অনেকদিন থেকেই জানে। তা নিয়ে পর্ণা দুঃখ করেছে, অভিমান করেছে, আমাকে তিরস্কারও করেছে বহুদিন। তবু ছেড়ে যায় নি, গভীর রাত্রে আমার পাশে এসে না শুয়ে পারেনি, পারেনি গলা জড়িয়ে না ধ'রে। কিন্তু কাল —'

সরিৎ একটু থামল।

ঊর্মিলা বলল, 'কিন্তু কাল?'

সরিৎ বলল, 'কিন্তু কাল পর্ণা ভিন্ন বিছানায় গিয়ে শুয়েছে। বললুম, 'অভিমান নাকি?' পর্ণা বলল, 'না, আর কোন অভিমান নেই, আর কোন দুঃখ নেই আমার। এবার বোধ হয় আমরা আলাদা হতে পারি।' বললুম, 'কেন?' পর্ণা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'ঊর্মিলা যদি তোমাকে কোনদিন

ছেড়েও যায়, তবু তোমাকে ছুঁতে আমার গা ঘিণ-ঘিণ করবে। তোমার প্রবৃত্তিটা দেখলাম একবার। আশ্চর্য, পৃথিবীতে কি আর মেয়ে ছিল না ?'

পর্ণার ঘৃণা যেন নিজের জিভের সঙ্গে জড়িয়ে এনেছে সরিৎ।

ঊর্মিলা বলল, 'তুমি কি বললে ?'

সরিৎ বলল, 'কি যে বলব ভেবে পেলাম না। কি বললে ভালো হোত বলো দেখি।'

বি, কে, পাল এভিনিয়ুতে পড়েছে মোটর। ঊর্মিলা বলল, 'এখানে থামাও। একবার প্রেস ঘুরে আসি।'

সরিৎ বলল, 'সে কি, এই সন্ধ্যার সময় প্রেসে গিয়ে করবে কি ?'

ঊর্মিলা হাসল, 'দেখে আসি কি রকম কাজকর্ম চলছে! তাছাড়া কপালে খানিকটা প্রেসের কালি মেখে আসতে পারি কিনা তাও দেখি চেষ্টা ক'রে। ভুল হয়েছিল, স্নো, পাউডারের বদলে একটু কালি যদি মেখে যেতাম তাহলে বোধ হয় দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হওয়ার কারণ মনে পড়ত। জবাব দিতে পারতে পর্ণার কথার।'

প্রেসে গিয়ে ঊর্মিলা খবর পাঠাল, সরিৎ যেন মোটর নিয়ে চলে যায়, তার বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। হেমন্ত বলল, 'এখানে তো আর কোন মেয়েছেলে নেই। আমরা পাঁচ ছ'জন

কম্পোজিটার রয়েছি। রাত্রে ওভারটাইম খাটব। এখানে আপনি কোথায় থাকবেন।'

উর্মিলা বলল, 'এখানেই, আমিও ওভারটাইম খাটতে চাই।'

হেমন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উর্মিলার দিকে একবার তাকাল, 'কিন্তু কম্পোজিং কি মনে আছে আপনার ?' উর্মিলা বলল, 'নিশ্চয়ই আছে। আমি যা শিখি তা কখনো ভুলি না।'

হেমন্ত বলল, 'তাই নাকি ? আমরা ভেবেছিলাম আপনি শেখেন আর ভোলেন।'

উর্মিলা এবার হেমন্তর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, এতদিন তো কেবল অক্ষর পরিচয়ের বিদ্যাই ছিল হেমন্তর। সে বিদ্যা এমন ক'রে বেড়ে গেল কবে ? সাহস এমন বেড়ে গেল কি ক'রে ?

উর্মিলা বলল, 'সে জন্য ভাববেন না। কেবল কম্পোজিংই তো নয়। প্রুফরীডিংও জানা আছে। নিজের ভুল নিজে শুধরে নিতে পারব। একটা প্রুফের বদলে না হয় দুটো প্রুফ উঠবে। দিন তো একটা কম্পোজিটারের সীট।'

হেমন্ত বলল, 'তার চেয়ে আপনি বরং বাড়ি যান।'

উর্মিলা বলল, 'না। বরং আমি যা বলছি, তাই আপনি শুনুন।'

নিভাননী প্রথমে লোক পাঠালেন, তারপর ব্যস্ত হয়ে রিকসায় ক'রে নিজে এলেন প্রেসে। বললেন, 'তোর কি

মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে উর্মি? জাতজন্ম কিছু আর রাখবিনে? এই এক পাল পুরুষের মধ্যে — ছি ছি ছি। হেমন্ত, জোর ক'রে তুমি মেয়েটাকে তুলে দাও দেখি গাড়িতে।'

ঊর্মিলা একটু হাসল, 'খবরদার হেমন্ত বাবু, গায়ে হাত দেবেন না, এমন চমৎকার জর্জেটটায় কালি লেগে যাবে।'

হেমন্ত বলল, 'পাগলামী করবেন না, আপনি যান মার সঙ্গে। প্রেসে কাজ করতে চান দিনের বেলা করবেন। আপনি যা ভুলে গেছেন তা আমার শিখিয়ে দিতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

নিভাননী বললেন, 'আর প্রেস প্রেস ক'রো না বাপু, আর প্রেস নয়, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। কেলেঙ্কারীতে আর কাণ পাতবার জো নেই। আমি বলে রাখলুম, কাল ভোরে উঠে যার মুখ দেখব তার সঙ্গেই বিয়ে দেব মেয়ের।'

হেমন্ত আর ঊর্মিলার চোখাচোখি হোল মুহূর্তের জন্য। একটু বুঝি ইতস্তত করল ঊর্মিলা; খানিক দূরে ঘরের মধ্যে কম্পোজিটাররা কাজ করছে, কিন্তু কান পেতে সকলেই শুনছে সব কথা। মা আর কিছুই বলতে বাকি রাখেননি। চোখ নামিয়ে নিয়ে ফের হেমন্তর দিকে চোখ তুলল ঊর্মিলা, সেই বসন্তের দাগভরা মুখ, কিন্তু আর কোন দাগ নেই। দৃঢ়, ঋজু চেহারা।

হেমন্ত কি দেখল সেই জানে, সস্নেহে বলল, 'যান, ঘরে যান।'

উর্মিলা আর ইতস্তত করল না। সমস্ত লজ্জা, সমস্ত সংকোচ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'যাচ্ছি। কিন্তু কাল খুব ভোরে উঠে মা যেন আপনার মুখই দেখেন হেমন্তবাবু। আবার কোন্ অন্‌জাতের হাতে পড়ব তার দরকার কি?'

হেমন্ত নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

হাত ধরে নিভাননী রিকসায় টেনে তুললেন মেয়েকে।